তৃতীয় অধ্যায়

রূপরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে মধ্যযুগের সমাজ-সংস্কৃতি ও জীবনচর্চার বৈচিত্র্য অন্বেষণ

মধ্যযুগীয় সাহিত্য ধারার অন্যতম ধারা হল মঙ্গলকাব্য, আর এই ধারার অন্যতম প্রধান শাখা ধর্মমঙ্গল কাব্য। ধর্মমঙ্গলের কাহিনী মধ্যযুগে অনেক আগে থেকেই ছড়া ও ব্রতকথার আকারে প্রচলিত ছিল। ধর্মমঙ্গলের আদি কবি হিসেবে আমরা পেয়েছি ময়ূরভট্টকে, তবে তাঁর কাব্য পাওয়া যায়নি। তবে এই ধারার অন্যতম একজন কবি রূপরাম চক্রবর্তী। তিনিই সপ্তদশ শতকে প্রথম সংহত রূপ দান করেন ধর্মমঙ্গলের কাহিনীর। সুতরাং রূপরাম চক্রবর্তীকেই আমরা ধর্মমঙ্গল কাব্যের স্বয়ং সম্পূর্ণ কবি হিসেবে পেয়েছি। রূপরামের কাব্যের প্রভাব আমরা পরবর্তী সকল ধর্মমঙ্গল রচয়িতাদের মধ্যেই পেয়েছি। ধর্মমঙ্গল কাব্যের রচয়িতাদের মধ্যে রূপরামের কাব্যই সর্বাধিক প্রচারিত। সৃষ্টির দিক থেকে আমরা রূপরাম চক্রবর্তীকে চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর সমগোত্রীয় মনে করে থাকি।

রূপরাম চক্রবর্তী কাব্যের শুরুতেই সুন্দর সহজ সরল ভাষায় আত্মপরিচয় দিয়েছেন যা হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে। তাঁর আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় তিনি বর্তমান বর্ধমান জেলার কাইতি গ্রামের অদূরে ও দামিন্যার অনতিদূরে শ্রীরামপুর গ্রামে কবির নিবাস ছিল পুরুষানুক্রমে। তাঁর পিতার নাম শ্রীরাম চক্রবর্তী ও মায়ের নাম দময়ন্তী দেবী। রূপরামের পিতা ছিলেন টোলের পণ্ডিত। কবি বাল্যকালেই পিতৃহারা হন। কবিরা ছিলেন পাঁচ ভাই-বোন। রত্নেশর ও রামেশ্বর তাঁর দুই ভাই এবং সোনা ও হীরা দুই বোন ছিল। কবি তাঁর বড় ভাইয়ের সাথে দ্বন্দে জড়িয়ে গৃহত্যাগ করে অন্যত্র পড়াশোনার জন্য চলে যান। কবি তাঁর আত্মপরিচয়ে লিখেছেন –

"বড় দাদা রত্নেশ্বর বড় নিদারুণ।
খাত্যে শুত্যে বাক্য বলে জ্বলন্ত আগুন।।
খাত্যে ঘুত্যে মন্দবাক্য বলে নিরন্তর।
মনে হইল পড়িতে যাইব দেশান্তর।।
মনঃকথা মরমে বান্ধিল খুঙ্গি পুথি।"[১]

রূপরাম খুঙ্গি পুথি নিয়ে বুধবার দিনে নিঃস্ব অবস্থায় গৃহত্যাগ করেন। কবির পরিচিত মণিরাম দিলেন ধুতি এবং রাজারাম রায় দিলেন বারো পণ কড়ি। কবি বাড়ি ত্যাগ

করে গিয়ে উপস্থিত হলেন পণ্ডিত রঘুনাথ ভট্টাচার্যের টোলে। পথশ্রান্ত রূপরামকে দেখে ভট্টাচার্যের মায়া হলে তিনি তাকে আশ্রয় দেন এবং যত্ন সহকারে পড়াতে লাগেন –

"রঘুরাম ভট্টাচার্য কবিচন্দ্রের পো।
খুঙ্গি পুথি দেখিয়া হইল মায়া মো।।
বেটা বলি বাসা দিল নিজ নিকেতন।
যতনে পড়ান পাঠ হরষিত মনে।।"[২]

পড়াশোনার প্রতি রূপরামের আগ্রহ দেখে পণ্ডিত যত্ন সহকারে তাঁকে পড়াতে শুরু করেন। রঘুনাথ ভট্টাচার্য পণ্ডিত ব্যক্তি হলেও তিনি ছিলেন অসহিষ্ণু প্রকৃতির। তবে ভট্টাচার্যের সহিত কবির মনোমালিন্য হওয়ায় তিনি গুরুর ভর্ৎসনায় দুঃখিত হয়ে আড়ুই গ্রাম পিছনে ফেলে তিনি ঘরে ফেরার জন্য পথে বের হন। মায়ের সাথে দেখা হওয়ার বাসনা নিয়ে তিনি বিপদসঙ্কুল ও পরিত্যক্ত পথ ধরেন। কিন্তু পথ হারিয়ে দিশেহারা হয়ে তিনি এদিক ওদিক ঘুরতে লাগলেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পান তাঁর মাথার উপর দুইটি শঙ্খচিল ও সেই সঙ্গে বাঘের দেখা পেয়ে তিনি বিভ্রান্ত হয়ে দৌড়তে লাগলেন এবং আছাড় খেয়ে পরে গিয়ে হাতের সব পুথি হাড়িয়ে ফেলেন। এমন সময় ধর্মঠাকুর এসে তাঁর দুটি পুথি খঁজে দেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর মাহাত্ম্য গীতি লেখার আদেশ দিয়ে অন্তর্হিত হলেন। কাব্যের মধ্যে এই অংশের মনোরম ব্যাখ্যা করেছেন কবি –

"প্রথমে আপনি প্রভু কুড়াইল পুঁথি।
সম্মুখে দাণ্ডাল যেন ব্রাহ্মণ মুরতি।।
সুবর্ণ পৈতা গেল পতঙ্গ সুন্দর।
কলধৌত কাঞ্চন কুন্দল ঝলমল।।
তরাসে বিকল তনু প্রাণ দুর দূর।
আপনি বলেন তবে দয়ার ঠাকুর।।
আমি ধর্মঠাকুর বাঁকুড়া রায় নাম।
বার মতি গীত গাও শুন রূপরাম।।
ঠাকুর বলেন তুল্যা রাখ খুঙ্গি পুথি।
কালি হৈতে আম্মার গাবে বারমতি।।"[৩]

রূপরাম এরপর বাড়ি ফিরে এলে দাদার কটূ কথা শুনে তিনদিনের উপবাসী রূপরামকে আরেকবার গৃহ ত্যাগ করতে হল। এবার সে নানা পথ অতিক্রান্ত করে গোপালভূমে এসে উপস্থিত হয়ে সেখানকার রাজা গণেশ রায়ের আশ্রয় নিয়ে তিনি তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্য সমাপ্ত করেন। কবি বলেছেন –

"গোপালভূমের রাজা গণেশ রায় নাম।
বিপ্রকূলচূড়ামণি বড় ভাগ্যবান।।
তার গিয়া সপন দিলেন মায়াধর।
প্রভাতে ভূপতি দিল মন্দিরা চামর।।
প্রতিষ্ঠা করিল মোরে দিয়া নানা ধন।
আচম্বিতে দুই পালি দিল দরশন।।
পালি দেখি মহারাজ আনন্দিত মনে।
বারমতি গীত জোড়াইল শুভক্ষণে।।"[৪]

সর্বোপরি রূপরামের আত্মকাহিনী অংশের যে বিবরণ দিয়েছেন তা তাঁর ব্যক্তিসত্তার সার্বিক পরিচয় প্রদান করে। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য ধারায় তাঁর মতো এতো সুন্দর আত্মকাহিনীর বিবরণ আর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না, সেই কারণেই রূপরাম মধ্যযুগের সাহিত্যে একক স্থান অধিকার করে আছেন।

রূপরামের কাব্য রচনা কাল বিষয়ে বহু মতভেদ রয়েছে। কারণ তিনি কাব্যের রচনা কাল উল্লেখ করেছেন একটি দুর্বোধ্য হেঁয়ালির মাধ্যমে। তবে পণ্ডিত ও সমালোচকেরা সেই হেঁয়ালির মধ্য থেকেই তাঁর কাব্যের রচনা কাল নির্ণয় করেছেন। সুকুমার সেন ও পঞ্চানন মণ্ডল তাঁদের সম্পাদিত 'রূপরামের ধর্মমঙ্গল' (বর্ধমান সাহিত্যসভা) কাব্যের হেঁয়ালির সমাধান করে রূপরামের কাব্যের কাল নির্ণয় করেছেন এভাবে। কবি তাঁর কাব্যের ভূমিকায় কাব্যের সমাপ্ত কাল সম্বন্ধে বলেছেন –

"শাকে সিমে জড় হৈলে যত শক হয়।
তিন বাণ চারি যুগ বেদে যত রয়।।
রসের উপর রস তায় রস দেহ।
এই শকে গীত হৈল লেখা কর্যা লেহ।।"[৫]

অর্থাৎ,

শাকে x সিমে = ১০ x ১১ x ১২ =১৩২০ (শাক = ১০, ১১ ; সিম = ১২)

তিন বাণ + চারি যুগ + বেদ = ১৫ + ১৬ + ৪ = ৩৫ (বাণ = ৫, যুগ = ৪, বেদ = ৪)

রস x রস x রস ৬ x ৬ x ৬ = ২১৬ (রস = ৬)

১৫৭১ শকাব্দ বা ১৬৪৯ খ্রীস্টাব্দ।

সুকুমার সেন ও পঞ্চানন মণ্ডলের এই গনণা সাহ সুজার আমলের সময় কালের কথা বলে। যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি জাড়াগ্রামের পুথির বিশ্লেষণ করে ''সাকে সিমে জড়'

কে 'চারি বাণ তিন যুগ' করে নিয়ে রূপরামের রচনাকাল পান ১৫২৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬০৪ খ্রিষ্টাব্দ। তবে রূপরামের আত্মকাহিনীতে শাহ সুজার উল্লেখ রয়েছে দেখে তিনি তাঁর পূর্বের মত খণ্ডন করে পুনরায় গনণা করে রূপরামের কাব্যের সময়কাল ধরেন ১৫৮৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৬৪ খ্রিষ্টাব্দ; অর্থাৎ শাহ সুজার রাজত্বকালের শেষের দিকে রূপরাম তাঁর কাব্য রচনা করেন। দীনেশচন্দ্র 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়' (দ্বিতীয় খণ্ড) গ্রন্থে জানিয়েছেন রূপরাম চক্রবর্তী পঞ্চদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হন।

ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন রূপরামের কাব্যের রচনা কাল ১৫১২ শকাব্দ বা ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দ। ড. ভট্টাচার্যের মতে রূপরামের মূদ্রিত পুথির (সুকুমার সেন সম্পাদিত) কালবাচক পয়ারের বিশুদ্ধ পাঠা হবে আলাদা –

"তিন বাণ চারি যুগ বেদে যত রয়।
শকে সনে জড় হইলে কত শক হয়।।
রসের উপরে রস তাহে রস দেহ।
এই শকে গীত হৈল লেখা কইরা লেহ।।"[৬]

তিনি মনে করেন রূপরামের হেঁয়ালিতে শক (শকাব্দ) ও সন (হিজরী) দুই রকম সনের উল্লেখ আছে। শকাব্দ অনুসারে তিনি হেঁয়ালির গণনা করেন বাণ ৩ x ৫, চারযুগ ৪ x ৪ ১৫১৬ শকের থেকে ৪ বেদ বাদ দিলে ১৫১২ শক বা ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দ হয়, অন্যদিকে হিজরী সন অনুসারে গণনা করে রস + রস + রস = ৯৯৯ হিজরী অর্থাৎ ১৫৯০ খ্রিস্টাব্দ পাওয়া যায়। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য শক ও হিজরী সন গণনা করে একই সময় পান। তবে রূপরামের কাব্যের ভাষা বিচার করে তাকে কখনই ষোড়শ শতকের কবি বলা যায় না, রূপরামকে সপ্তদশ শতাব্দীর কবি বলেই আমরা মনে করি।

সপ্তদশ শতাব্দি থেকে অষ্টাদশ শতাব্দির প্রারম্ভ পর্যন্ত প্রায় একবছর বাংলার সামাজিক জীবন বিকাশের ইতিহাস হিন্দু-মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। তখনকার দিনে হিন্দু-মুসলমানেরা নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে না জড়িয়ে তারা পারস্পরিক সম্প্রিতীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকত। তুর্কি আক্রমনের অভিঘাতের পরে বাংলা সাহিত্যে যে আখ্যায়িকা মূলক সাহিত্যধারা রচিত হয়েছিল, যা মঙ্গলকাব্য নামে পরিচিত। সেই ধারা সপ্তদশ শতাব্দীতে আবার নতুন করে রচিত হতে থাকে। ইতিমধ্যে মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের যে ধারা গড়ে উঠেছিল তা সপ্তদশ শতাব্দিতে বিভিন্ন কবিদের দ্বারা পুনরায় রচিত হয়ে বাংলাদেশে নতুন করে ছড়িয়ে পরে ভৌগোলিক সীমানা বাড়াতে লাগল, অন্যদিকে যেসব আঞ্চলিক দেবতার আখ্যান ব্রত কথার মতো সাধারণ মানুষের মুখে মুখে প্রচলিত ছিল তা উচ্চবর্ণের কবিদের দ্বারা নতুন করে সাহিত্যরূপ লাভ করতে

লাগল। রাঢ়ের আঞ্চলিক দেবতা ধর্মঠাকুরের এই মাহাত্ম্যকথা বিষয়ক রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি সমাজের এই মানসিকতার উদ্ভুত ফসল। বলা যায় রাঢ়ের ধর্মমঙ্গল কাব্যের উদ্ভব সমাজ মানসের অনিবার্য পরিণতিরই ফসল। রাঢ় বাংলা সর্বদা ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাব থেকে নিজেদের সরিয়ে রেখেছিল। রাঢ়বাসীরা ব্রাহ্মণ্য দৃষ্টিতে ঘৃণ্য ও নিন্দনীয় বলে বিবেচিত ছিল। মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ব্যাধ কালকেতুর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন –

"অতি নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়।
কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ়।।"[৭]

এই নিম্নবর্ণের, চোয়াড়দের মানসচক্ষুতে গড়ে ওঠা দেবতা ধর্মঠাকুর, রূপরামের কাব্যে গড়ে উঠেছে নিম্নবর্ণের আরাধ্য দেবতা হিসাবে। কিন্তু সমাজে পতিত ও নানা ভাবে পীড়িত হওয়ার আশঙ্কা সত্ত্বেও ব্রাহ্মণ্য কবিগণ ধর্মঠাকুরের কাছে আত্মনিবেদন করে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেছেন। তুর্কি আক্রমনের পরে রচিত মনসামঙ্গল বা চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মধ্যে যেভাবে আর্যধর্মী দেবতাদের উপর অনার্য শক্তি ও দেবতার বিজয়ের মাধ্যমে বাংলার ব্রাহ্মণেতর জনসমষ্টির অভ্যুদয় হয়েছিল ধর্মমঙ্গল কাব্যে তারই অভিপ্রকাশ ঘটেছে।

বাংলা সাহিত্যের ধারায় মনসামঙ্গলের কাহিনী সহজেই মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। তবে ধর্মমঙ্গলের কাহিনী তত চিত্তাকর্ষক না হলেও এর মধ্যে বীরত্ব, সাহসিকতা, প্রভুভক্তি, পুত্রহীনতা, অসৎ নারীর চিত্র সহজেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ধর্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ূরভট্ট হলেও রূপরামই প্রথম ধর্মমঙ্গলের কাহিনীকে পূর্ণতা দান করেন। তিনি কাব্যে প্রতিটি পালাকে সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন যা কাহিনীর গতিকে অনিবার্য গতি দান করেছে। রূপরাম ধর্মমঙ্গলের কাহিনী রচনা করতে গিয়ে কোথাও কোথাও শাখা-কাহিনী যুক্ত করেছেন, কোথাও ক্ষুদ্র কাহিনীর বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন। রূপরাম মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী কাব্যের শাপভ্রষ্ট নায়ক-নায়িকার মর্ত্যে পূজা প্রচারের জন্য তাদের আগমনের কাহিনীকে বর্ণনা করেছেন, যার জন্য রূপরামের কাব্য এক মহাকাব্যিক বিশালতা পেয়েছে। রূপরাম তাঁর কাব্যের কাহিনীকে পঁচিশটি পালায় বিভক্ত করেছেন, তা হল–বন্দনা পালা, স্থাপনা পালা, আদ্যঢেকুর পালা, রঞ্জার বিভাপালা, হরিশ্চন্দ্র পালা, শালেভর পালা, লাউসেন জন্ম পালা, লাউসেন চুরি পালা, আখড়া পালা, ফলা নির্মাণ পালা, মল্লবধ পালা, বাঘ জন্মপালা, বাঘবধ পালা, জামতি পালা, গোলাহাট পালা, হস্তিবধ পালা, কাঙুর যাত্রাপালা, কলিঙ্গা বিভাপালা, লৌহগণ্ডার পালা, কানড়া বিভাপালা, অনুমৃতা পালা, ইছাই বধ পালা, অঘোরবাদল পালা, জাগরণ পালা ও স্বর্গারোহণ পালা। উক্ত পালা

বিভাজনের মধ্য দিয়ে রূপরাম তার কাব্যের কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। এই পালা বিভাজন থেকেই আমরা রূপরামের কাব্যের সাধারণ পরিচয় লাভে অগ্রসর হয়েছি।

মঙ্গলকাব্যের একটি গতানুগতিক পালা বন্দনাপালা। মঙ্গলকাব্যের প্রায় সব কবিই দেবদেবীর বন্দনার মধ্য দিয়ে তাদের কাব্য রচনা শুরু করেছেন। রূপরামও তাঁর ব্যতিক্রমী হননি। তিনি গণেশ বন্দনার মধ্য দিয়ে কাব্য রচনা শুরু করেছেন, এরপর একে একে দেবী মহামায়া, সরস্বতী, চৈতন্যদেবের বন্দনার পর বিপ্র ও দিগ্‌বন্দনা করেছেন। রূপরাম মহামায়ার স্বরূপ বর্ণনায় পৌরাণিক মহিমার উপর জোড় দিয়েছেন, তেমনি চৈতন্যদেবকে তিনি শ্রীকৃষ্ণের অবতার রূপে বর্ণনা করেছেন। আবার অন্যদিকে বিপ্র বন্দনার মধ্য দিয়ে তাঁর বংশ কৌলিন্যের বর্ণনা করেছেন। তৎকালীন সময়ে রাঢ়বঙ্গে ব্রাহ্মণদের কিরূপে দেখা হত বা ব্রাহ্মনরাই নিজেদের অবস্থান কিরূপে কল্পনা করতেন তারই পরিচয় দিয়েছেন রূপরাম। দিগ্‌বন্দনা অংশে রূপরাম দক্ষিন ও পূর্বদিকের বন্দনা করে সেই স্থানের গ্রাম্যদেবতার বন্দনা গান করেছেন। রূপরাম প্রথমেই দক্ষিণ দিকের প্রধান দেবতা পুরীর জগন্নাথ দেবের বন্দনা করেছেন এবং রূপরাম জগন্নাথ দেবের বন্দনা ছাড়া পূর্বদিকের যেসমস্ত দেবতার বন্দনা করেছেন তারা সকলেই গ্রাম্য দেবতা এবং সকলেই দীর্ঘদিন ধরে সমাজে পূজিত হয়ে আসছেন। কবি তাঁর কাব্যে হিন্দুদেবতার পাশাপাশি মুসলিম পীর, ফকির, গাজীর নামের বন্দনা করেছেন। দিগ্‌বন্দনা অংশে চন্দ্রকেতু, রাজবলহাট, বর্ধমান, কালীঘাট, কুলেমালা, সেয়াখালা, তালপুর, জাড়গ্রাম, শ্রীরামপুর, বেতাই, মৌলা তালপুর, তমলুক, সেলাটিকরি প্রভৃতি যেসমস্ত স্থানের বর্ণনা করেছেন তার মধ্য দিয়ে আমরা রাঢ়বঙ্গের ভৌগোলিক পরিচয় পেয়ে থাকি। রূপরামের কাব্যে হিন্দু-মুসলিম সমস্ত দেবতার মহিমা গানের অংশটি সর্বতোভাবে চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে।

রূপরাম স্থাপনা পালায় সৃষ্টি কাহিনীর বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন সৃষ্টির আদিতে এক ব্রহ্ম এক নিরাকার নিরঞ্জন ছিল। দেব নিরঞ্জনের সৃষ্টির বাসনা থেকেই দেহ ধারণ করেন এবং তার নাসাপথ থেকেই উলুক বাহনের জন্ম হয় এবং উলুকের কথায় দেব নিরঞ্জন উদ্দ্যেশ্যহীন ভাবে চারিদিক ভ্রমণ করতে লাগলেন। নিরঞ্জন এবার বিশ্বসৃষ্টির ইচ্ছায় প্রকৃতির সৃষ্টি করলেন, জন্ম দিলেন – ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিন দেবতার। রূপরাম তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্যে বন্দনা ও স্থাপনা পালার কাহিনীর যেভাবে বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন তাতে মনে হয় পালাদ্বয় একত্রে দেবখণ্ড, কারণ স্বরূপ দেখা যায় এরপর থেকেই কাহিনী স্বর্গের সীমানা অতিক্রম করে মর্ত্যের ভূমিতে অগ্রসর হয়। স্বর্গের শাপভ্রষ্ট অপ্সরার মর্ত্যে আগমন

ঘটে এবং সেই দেবতার পূজা প্রচার করে যথাসময়ে স্বর্গে ফিরে যান। উক্ত দুই পালার কাহিনী পূর্ববর্তী মঙ্গলকাব্য (মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল) থেকে আলাদা হলেও মূলসুর একই।

আদ্যঢেকুর পালায় ইছাই ঘোষের কাহিনী আছে। রাজা গৌড়েশ্বর গৌড়ের রাজা হলেন এবং শাসনকার্য পরিচালনার জন্য তিনি তার শ্যালক মহামদকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেন। একদিন রাজা মৃগয়ার উদ্দেশ্যে রমতি নগরে এসে উপস্থিত হলেন এবং সেখানে বন্দী অবস্থায় সোমঘোষকে দেখে কারণ শুনলেন এবং তাকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি দিয়ে তাকে দক্ষিণ ঢেকুর গড়ের সামন্ত রাজা করে পাঠালেন। তিনি সেখানে বসতি নির্মাণ করে বসবাস করতে লাগলেন এবং ধীরে ধীরে তিনি বেশ প্রভাবশালী হয়ে উঠলেন। এরপর দেবী ভবানীর প্রসাদে একমাত্র পুত্র ইছাই ঘোষের জন্ম দেন, ইছাই ঘোষ দেবী ভবানীর ভক্ত হলেন এবং প্রবল পরাক্রমশালী হয়ে উঠলেন। ইছাই গৌড়ের ভাটের কাছ থেকে রাজকর কেড়ে নিয়ে তাঁকে তাঁড়িয়ে দেন এবং সেইসঙ্গে ইছাই কর্ণসেনকে আক্রমণ করে, তাঁকে পরাস্ত করলে কর্ণসেন গৌড়ের শরণাপন্ন হলেন। গৌড়েশ্বর তখন কর্ণসেনকে ময়নায় পাঠালেন। এরপর গৌড়েশ্বর কর্ণসেণের ছয়পুত্র ও প্রচুর সৈন্য নিয়ে মহামদকে ইছাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধে পাঠালেন, যুদ্ধে মহামদ পরাজিত হন ও কর্ণসেনের ছয়পুত্র মারা যায় ইছায়ের হাতে। কর্ণসেনের পুত্রদের মৃত্যুর পর তাঁর ছয়বধূ অনুমৃতা হন এবং তাঁর স্ত্রী শীলাবতী বিষ পান করে আত্মহত্যা করেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি যখন লেখা হয় তখন রাঢ়দেশ ছিল অরাজকতায় ভরা। রাজার শাসনের দূর্বলাতার সুযোগ নিয়ে সামন্ত শাসকেরা নিজেদের স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে; এই সমস্ত ঘটনারই ছায়াপাত ঘটেছে আদ্যঢেকুর পালার কাহিনীতে।

রঞ্জাবতীর বিবাহ পালাটি নানা কারণে ধর্মমঙ্গল কাব্যে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। কর্ণসেন তাঁর ছয়পুত্র কে হাঁড়িয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে হতাশায় দিন কাটাচ্ছে তখন গৌড়েশ্বর মহামদের অনুপস্থিতিতে তাঁর শ্যালিকার সঙ্গে কর্ণসেনের বিবাহ দিয়ে তাঁকে ময়নার অধিপতি করে পাঠান। কিন্তু কর্ণসেন-রঞ্জাবতী অপুত্রক হওয়ায় ভরা রাজসভায় মহামদ তাদের আঁটকুড়া ও বন্ধ্যা নারী বলে অপমান করেন। পুত্রলাভের আশায় রঞ্জাবতী তখন শালেভর দেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছেন। এই পালাটি পাঠক সমাজে গভীর ভাবে রেখাপাত করে। এখান থেকেই ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রকাশের সূচনা দেখতে পাই।

রূপরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যের পঞ্চম পালা হরিশ্চন্দ্র পালা। রঞ্জাবতি সন্তানলাভের আশায় যখন চাঁপায়েতে ধর্মপুজা ও শালেভর দিতে যাওয়ার আগে কর্ণসেণের অনুমতি চেয়েছে। কিন্তু কর্ণসেণ অনুমতি না দিলে রঞ্জাবতী অপুত্রক রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্রলাভের বিবরণ দেন। হরিশ্চন্দ্র পালার মূল বিষয়বস্ত হল, রাজা হরিশ্চন্দ্র ধর্মঠাকুরের কৃপায়

পুত্রলাভ করলেও ধর্মঠাকুর শর্ত দেন যে, পুত্রের নাম লুইচন্দ্র রাখতে হবে এবং তাকে ধর্মঠাকুরের উদ্দেশ্যে বলি দিতে হবে। এদিকে ধর্মঠাকুর যথাসময়ে সন্ন্যাসীর বেশে রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাছে এসে উপস্থিত হন এবং তিনি লুইচন্দ্রের মাংস খেতে চেয়েছেন। তখন রাজা হরিশ্চন্দ্র ও তাঁর স্ত্রীর মাথায় বজ্রাঘাত পরে। তখন লুইচন্দ্র সেখানে উপস্থিত হলে সন্ন্যাসী রাজা হরিশ্চন্দ্রকে পূর্বশর্তের কথা মনে করিয়ে দেন। সন্ন্যাসীর কথায় রাজা ও রাণী মদনা তখন লুইচন্দ্রকে বলি দিয়ে তিন ভাগ করে তিন রকম পদ রান্না করে তিন থালা আহার সাজিয়ে রাজা ও সন্ন্যাসী সহ খেতে বসেন। তখন ধর্মঠাকুর নিজের প্রকৃত রূপ ধারণ করে লুইচন্দ্রকে ফিরিয়ে দেন। রাজা কর্ণসেন রঞ্জাবতীর মুখে এই কথা শুনে তিনি তাকে চাঁপায়েতে ধর্ম পূজা করার অনুমতি দেন।

ষষ্ঠপালা রঞ্জাবতীর শালেভর পালা। এখানে রঞ্জাবতীর সাধনা ও পুত্রসন্তান লাভে আত্মত্যাগের কথা পাওয়া যায়। রঞ্জাবতী চাঁপায়েতে ধর্মপূজার আয়োজন করে পুত্রলাভে ব্রতী হয়ে ব্যর্থ হন। ব্যর্থ হয়ে রঞ্জাবতী নিজের শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আঘাত ও পীড়ন করে ধর্মের কৃপা লাভের চেষ্টায় ব্যর্থ হয়, ব্যর্থ হয়ে তিনি আরোও কঠিন ব্রত নিয়ে শালেভর দিয়ে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেন। এরপর ধর্মের কৃপা লাভ করে রঞ্জাবতী পুত্রসন্তান লাভ করে। রঞ্জাবতীর শালেভর পালার কাহিনী খুবই মর্মস্পর্শী ও করুণ। তৎকালীন সময়ে সমাজে সন্তানহীন বন্ধ্যা নারীদের সমাজে খুবই নিচু নজরে দেখা হত এবং তারা পুত্রলাভের আশায় কিরূপ কৃচ্ছ্রসাধন করতেন তারই বর্ণনা রয়েছে এই পালায়।

লাউসেন জন্ম পালায় দেখা যায় ধর্মঠাকুর রঞ্জাবতীকে পুত্রবর দেওয়ার জন্য মর্ত্যে অবতীর্ণ হয়ে রঞ্জাবতির প্রান ফিরিয়ে দেন এবং তাঁকে ময়নায় কর্ণসেনের কাছে ফিরে যেতে বলেন। যথা সময়ে রঞ্জাবতীর গর্ভে পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। লাউসেন জন্ম পালার কাহিনী পূর্বের শালেভর পালার সঙ্গে সম্পৃক্ত। এরপর দেখা যায় রূপরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে লাউসেন চুরি পালায় লাউসেনকে চুরি করার জন্য মহামদ ইন্দেমেটা চোরকে পাঠান। লাউসেনের জন্মের পর কর্ণসেন যখন গৌড় রাজদরবারে ঝটপট পত্র পাঠান, তাতে গৌড়ের সকলেই অত্যন্ত খুশী হন। একমাত্র মহামদ তা মেনে নিতে পারেননি, তিনি সরলমতি গৌড়েশ্বরকে লাউসেনের শত্রু বানিয়ে তাঁর সম্মতি আদায় করে তিনি লাউসেনকে চুরী করার পরিকল্পনা করে চোর পাঠান ময়নায়। চোর ইন্দেমেটা ময়নায় গিয়ে দেবী ভবানীর প্রার্থনা করে লাউসেনকে চুরি করে নিয়ে আসেন। কিন্তু ধর্মঠাকুর মনে করলেন লাউসেন নিহত হলে মর্ত্যে তার পূজা প্রচার হবে না, তখন তিনি হনুমানকে পাঠালেন লাউসেনকে উদ্ধার করে তাঁর কাছে নিয়ে আসতে। এদিকে চোরেদের সিদ্ধির নেশা কেটে গেলে তাঁরা বাঁজিবেনা জঙ্গলে লাউসেনকে দেখতে না পেয়ে কুকুরের রক্ত

নিয়ে গৌড়েশ্বরের কাছে উপনীত হলেন, তা দেখে গৌড়েশ্বর খুশী হলেন। অন্যদিকে লাউসেন চুরি যাওয়ার পর রঞ্জাবতী অঝোরে কেঁদে চলেছেন, তখন ধর্মঠাকুর হনুমানকে নির্দেশ দেন রঞ্জাবতীর কাছে লাউসেনকে ফিরিয়ে দিতে এবং সেইসঙ্গে একপুত্র নয় তিনি দুইপুত্র লাউসেন ও কর্পুরকে ফিরিয়ে দেন। ময়নার রাজপুরীতে দুইভাই মিলে বড় হতে লাগলেন। লাউসেন কর্পূরের থেকে বলবান ও সাহসী হয়ে উঠলেন। লাউসেন ও কর্পূর দুজনেই গুরুগৃহে শিক্ষা লাভ করতে গেলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই তাঁরা বিদ্যাশিক্ষায় পারঙ্গম হয়ে উঠলেন। বিদ্যা শিক্ষা শেষে দুই ভাই মল্লবিদ্যা শিক্ষার জন্য অগ্রসর হন এবং এখানেই লাউসেন জন্মপালার সমাপ্তি ঘটে।

লাউসেন জন্ম পালার কাহিনী বৈচিত্র্য বেশ চিত্তাকর্ষক হয়ে উঠেছে সৃজনের নৈপুন্যে। ইন্দেমেটা ও তাঁর সঙ্গীদের দেবী ভবানীর আশীর্বাদ লাভ এবং নিদ্রাসহযোগে ময়নার সমস্ত লোকেদের নিদ্রায় অচেতন করার ঘটনাকে রূপরাম বেশ চিত্তাকর্ষক করে পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। রূপরাম গৌড়েশ্বর চরিত্রের সরলতার দিকটিকে তুলে ধরেছেন, তাঁর সরলতার সুযোগ নিয়ে মহামদের তাঁর উপর জোর খাটানো, তাঁর মাথায় কুকুরের রক্ত ঢেলে দেওয়া, গৌড়েশ্বরের কুকুরের রক্তে স্নান করা এবং তাঁর কুকুরের মতো আচরণ করা – যা হাসির খোঁরাক জুগিয়েছে। তুলনায় মহামদ চরিত্রটি অনেক বেশী সজীব ও সচল এবং জীবন্ত হয়ে দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন দিক থেকে পালাটির তাৎপর্য বেশ গুরুত্বিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

আখড়া পালার কাহিনীকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। একটি ভাগে রয়েছে লাউসেন ও কর্পুরের মল্লবিদ্যা শিক্ষা এবং দ্বিতীয় ভাগে রয়েছে দেবী ভবানীর লাউসেনকে ছলনা করার কথা। লাউসেন মল্লবিদ্যা শিক্ষার কথা শুনে ধর্মঠাকুর পবন পুত্র হনুমানকে পাঠান লাউসেনের মল্লবিদ্যা শিক্ষার গুরু করে। এ জন্য হনুমান বিংশতি কাহন দক্ষিণা ধার্য করেন কর্ণসেনের কাছে। কিন্তু লাউসেন বৃদ্ধ মল্ল দেখে বেকে বসে। তখন হনুমানকে নানা কেরামতি দেখিয়ে লাউসেনকে বশে আনতে হয় এবং হনুমান নিষ্ঠার সঙ্গে দুই ভাইকে মল্ল বিদ্যা শেখাতে থাকেন। দ্বিতীয় কাহিনীতে দেখা যায় দেবী ভবানী আশ্বিন মাসে মর্ত্যে তাঁর পূজা কোথায় কেমন ভাবে হচ্ছে তা দেখার জন্য শিবের কাছে অনুমতি নিয়ে বিশেষ রথে করে জয়মঙ্গল অস্ত্র নিয়ে মর্ত্যে ভ্রমণ করেন এবং দেখলেন একমাত্র ময়না নগরে তাঁর পূজা হচ্ছে না, তিনি কারণ জানতে পারলেন যে, ময়নায় ধর্মের পুজাপাঠ করা হয় বলে এখানে অন্য কোন পূজা করা হয় না। তখন দেবী ভবানী লাউসেনকে ছলনা করার জন্য গণিকার ছদ্মবেশ ধারন করে আখড়ায় প্রবেশ করে ছলনা করে লাউসেনের চিত্ত চঞ্চল করার চেষ্টা করেন, কিন্তু লাউসেন বিচলিত না হয়ে সংযমের পরিচয় দেয়।

দেবী ভবানী লাউসেনের সংযমে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর দিতে চাইলে লাউসেন দেবীর দুর্জয় অসি প্রার্থনা করে। দেবী লাউসেনকে শেষ পর্যন্ত দুর্জয় অসি দান করে। লাউসেনের ইচ্ছা জাগে দুর্জয় অসি পেয়ে সে গৌড়ে গিয়ে চাকরী করে ময়নায় অনেক মন্দির গড়ে তুলবেন। তবে দুর্জয় অস্ত্রের জন্য সমপরিমাণ ফলা প্রয়োজন। কিন্তু লাউসেনের কোন ফলা পছন্দ না হওয়ায় কর্ণসেন নন্দ কর্মকারকে বলেন ফলা নির্মাণ করার জন্য। কিন্তু ময়নায় উপযুক্ত কাঠ না পেয়ে ক্লান্ত হয়ে কর্মকার নিদ্রা যান, সেইসময় ধর্মঠাকুর তাকে স্বপ্নে দেখা দিলেন এবং নন্দ কর্মকার যে গাছের নীচে শুয়ে পড়েছিলেন সেই গাছ কেটে এনে শালঘরে রাখলেন। ধর্মমঙ্গল বীররসাত্মক কাব্য, তাই এখানে নানারকম উপকাহিনী ও ঘটনার সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্য দিয়েই ধর্মমঙ্গলের কবিরা কাব্যের গঠনভঙ্গীতে খানিকটা মহাকাব্যের আভাস দিতে সমর্থ হয়েছেন।

ফলা নির্মাণ পালায় ধর্মঠাকুরের কথায় নন্দ কর্মকার শালঘরে ফলা নির্মাণের কাঠ রেখে চলে গেলে তাঁর ফিরে আসার আগেই ধর্মঠাকুর নিজ পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে বিশ্বকর্মাকে দুর্জয় অসির ফলা নির্মাণের নির্দেশ দেন। ধর্মঠাকুরের কথা মতো বিশ্বকর্মা সেই রাতেই রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের বিভিন্ন কাহিনী ও চিত্র খোদাই করে ফলা নির্মাণ করে সেখানে ঢাকা দিয়ে চলে যান। পর দিন নন্দ কর্মকার এসে দেখেন যে ফলা নির্মাণ হয়ে গিয়েছে এবং সে ভাবলো যে এটা বিশ্বকর্মার কাজ। কর্মকার তখন সেই ফলা নিয়ে কর্ণসেনের কাছে উপস্থিত হন। লাউসেন ফলা পাওয়ার পর খুশি হয়ে বলে যে সে গৌড়ে গিয়ে চাকরী করে ময়নায় মন্দির তুলে দিবে। এখানেই ফলা নির্মাণ পালার সমাপ্তি ঘটে। ফলা নির্মাণ পালা থেকে লাউসেনের অপরাজেয় বীরের পরিচয় পাওয়া যায়। অপরাজেয় অস্ত্র লাভের জন্যই লাউসেন বীরের মর্যাদা পেয়েছে এই পালায় তাই দেখানো হয়েছে।

এরপর দেখা যায় লাউসেন যখন গৌড় যাত্রা করতে চেয়েছে তখন রঞ্জাবতী তাকে মানা করে দিয়েছে এবং সেইসঙ্গে কর্ণসেনের সঙ্গে মন্ত্রণা করেছে যে লাউসেনকে সারেঙ্গধল মল্লের সঙ্গে লড়াই করিয়ে তাঁর হাত পা ভেঙ্গে তাঁকে ময়নায় রেখে দিতে, যাতে করে লাউসেন গৌড় না যেতে পারেন এবং লাউসেন রঞ্জাবতির কাছে থেকে যেতে পারে। এই মর্মে কর্ণসেন রমতি নগরে অবস্থিত মহামদের কাছে পত্র পাঠান সারেঙ্গধল মল্লকে আনানোর জন্য। মহামদ কর্ণসেনের পত্র পেয়ে লাউসেনকে হত্যা করার সুযোগ পেয়ে মহামদ শক্তিধর সারেঙ্গধল মল্লকে পাঠিয়ে দেন এবং তাঁর অভিসন্ধির কথা জানিয়ে দেন সারেঙ্গধলকে। সারেঙ্গধল মল্ল যথাসময়ে ময়নায় গিয়ে উপস্থিত হয়। রঞ্জাবতী সারেঙ্গধল মল্ল কে জানায় যে লাউসেন যেন দেশান্তর না হতে পারে সে জন্য তিনি যেন তাঁর পা

খোঁড়া করে দেয়, এই অনুরোধ করেন রঞ্জাবতী। এরপর সারেঙ্গধল মল্ল তাঁর সঙ্গী আরো ছয় মল্লকে সঙ্গে করে আখড়ায় উপস্থিত হন। লাউসেন দূর থেকে তাদের আসতে দেখে কর্পুরকে পাঠান তাদের নাম, কোথা থেকে আসছেন, কি উদ্দেশ্যে আসছেন তা জানার জন্য। সারেঙ্গধল মল্লরা আখড়ায় প্রবেশ করার আগেই কর্পূরকে মহামদের অভিসন্ধির কথা জানিয়ে দেন যা শুনে লাউসেন ক্রুদ্ধ হয়ে তাদের সঙ্গে মল্ল যুদ্ধ শুরু করে। লাউসেনের পরাজয় ঘটে, তার হাত-পা ভেঙ্গে যায়, মুখ দিয়ে রক্ত বের হতে থাকে। ধর্মঠাকুর তাঁর বরপুত্রের এরূপ অবস্থা দেখে হনুমানকে আদেশ দেন সেখানে গিয়ে তাঁর সমস্ত শক্তি যেন লাউসেনের শরীরে প্রদান করে, এবং হনুমান তাই করে তাঁকে জয়ী হওয়ার বর দেন। এরপর লাউসেন পুনরায় সারেঙ্গধলকে যুদ্ধে আহ্বান করেন এবং সারেঙ্গধল মল্ল ও তাঁর ছয় সঙ্গীকে হত্যা করে তাদের কালিনীর জলে ভাসিয়ে দেন। এরপর দুই ভাইয়ের গৌড় যাওয়ার বাসনা আরো বৃদ্ধি পায় এবং তাঁরা পিতা-মাতার কাছ থেকে কাকুতি-মিনতি করে প্রয়োজনীয় অনুমতি আদায় করে গৌড়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। এখানেই মল্লবধ পালার সমাপ্তি ঘটে। মল্লবধ পালায় আমরা মাতৃহৃদয়ের অনর্থক আশঙ্কার পরিচয় পাই। দেখা যায় দুই ভাই যখন গৌড় যাত্রার অভিসন্ধি করে তখন রঞ্জাবতী সারেঙ্গধল মল্ল আনিয়ে দুই ভাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত করিয়ে তাদের হাত পা ভেঙ্গে বাড়িতে রেখে দিতে চেয়েছে, তাতে কোন ক্ষতি নেই; কারণ তাঁরা মায়ের কাছেই থাকবে যা রঞ্জাবতীর কাছে সুখের। কিন্তু রঞ্জাবতী শেষ পর্যন্ত লাউসেন ও কর্পূরকে গৌড় যাত্রার অনুমতি দেন, তবে পুত্রদের মুখ থেকে কিছু অঙ্গীকার করিয়ে। রূপরাম চক্রবর্তী মল্লবধ পালার মধ্য দিয়ে বাঙালি মাতৃহৃদয়ের চিরন্তন সত্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

বাঘজন্ম পালায় আমরা দেখতে পাই লাউসেন ও কর্পুর দুই ভাই পিতা-মাতার আশীর্বাদ নিয়ে গৌড়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে তারা জালান্দার গড়ে এসে উপনীত হয়। লাউসেন এই দেশ সম্বন্ধে জানতে চাইলে কর্পূর তাঁকে জালান্দার গড় সম্বন্ধে পৌরাণিক আখ্যান বিস্তারিত ভাবে জানায় যে, কামদল নামে একটি বাঘ আছে; সে সামান্য বাঘ নয়। স্বর্গে ইন্দ্রের সভায় কলাধর নামে একজন নর্তক ছিলেন। তাঁর নৃত্য দেখার জন্য দেবী ভবানী বাঘে চেপে ইন্দ্রের সভায় আসেন। দেবতারা তাঁর নৃত্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে বর দিতে চাইলে সেই সময় কলাধর দেবী ভবানীর বাঘে চেপে আসা দেখে হেসে ফেলেন, তখন দেবী ভবানী তাঁর এই কটাক্ষ দেখে তাঁকে শাপ দিলেন যে, মর্ত্যে তাঁকে বাঘিনীর গর্ভে জন্ম নিতে হল। ব্যাঘ্র শিশু রূপে কলাধরের জন্মের পর তাঁর নাম হল কামদল। কামদল জলাধার গড়ে নিজের কর্তৃত্ব কায়েম শুরু করেন। লাউসেন কর্পূরের মুখে এই কথা শুনে তাঁকে জলান্দার গড়ে খুঁজতে শুরু করে তাঁকে না পেয়ে ধর্মঠাকুরের শরণাপন্ন হয় এবং

কামদল ধর্মের মায়াতৃষ্ণায় দিঘিতে জল খেয়ে কেদঙগাছের তলায় নিদ্রায় যায়। লাউসেন তাঁকে সেখানে দেখে মনে করে নিদ্রিত অবস্থায় শত্রুকে আঘাত করা মহাপাপ। তখন কামদলকে জাগানর জন্য উত্যক্ত করতে থাকেন লাউসেন, এখানেই বাঘজন্ম পালার সমাপ্তি ঘটে।

নিদ্রারত শত্রুকে হাতের কাছে পেয়েও তাঁকে হত্যা না করে তাঁকে জাগানোর চেষ্টা করে লাউসেন। আপ্রাণ চেষ্টা করেও যখন লাউসেন কামদলকে জাগাতে পারছেন না, তখন তাঁর গায়ে একটা চাপড় কষিয়ে তাঁকে জাগানোর পর কামদল লাউসেনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। তখন লাউসেন নিজেকে বাঁচানোর জন্য দেবী প্রদত্ত দুর্জয় অসি বের করে বাঘের সামনে ধরলে বাঘ বিমোহিত হয়ে ফলার দিকে তাকিয়ে থাকে। তখন বাঘ বুঝতে পারে এই মানুষটির হাতেই তাঁর মুক্তি এবং তা জেনে বাঘ লাউসেনকে উত্যক্ত করতে থাকে নানা বাক্য বিনিময়ে। লাউসেন বাঘের কথায় উত্তেজিত হয়ে কামদলের সাথে যুদ্ধ শুরু করে এবং কামদল বাঘ যেহেতু দেবীর বরে অজেয় ছিল তাই লাউসেন বাঘের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হল। লাউসেন বাঘের সাথে বারবার যুদ্ধ করেও পরাজিত হতে থাকে। পরপর সাতবার পরাজিত হয়ে লাউসেন সবশেষে ধর্মের আরাধনা করে। ধর্মঠাকুর লাউসেনের আকুতিতে হনুমানকে পাঠায় এবং হনুমান লাউসেনকে প্রয়োজনীয় শক্তি দেয় কামদলকে বধ করার জন্য। অবশেষে লাউসেন কামদল বাঘকে পরাজিত করে তাঁর লেজ কেটে নেয় প্রমাণ স্বরূপ গৌড়েশ্বরকে দেখানোর জন্য। কামদল বাঘকে বধ করে লাউসেন পরিশ্রান্ত হয়ে কর্পূরকে জল আনতে বলে সরোবর থেকে। কিন্তু কর্পূর সেখানে গিয়ে দেখে যে, সরোবরের জল কালনাগিনীর বিষে কালো হয়ে আছে। কর্পূর তা জানানোর জন্য যখন লাউসেনের কাছে আসে, তখন দেখতে পায় লাউসেনের মাথার উপর দুটি সাপ ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এবং তাঁকে জাগানোর চেষ্টা করেও যখন নিদ্রাভঙ্গ করাতে পারেননি কর্পূর তখন সর্পবিষনাশের মন্ত্র পড়া শুরু করে। লাউসেন ঘুম থেকে উঠে কর্পূরের মুখে সব শুনে দেখে যে, কর্পূর শিউলির পত্রকে সাপ ভেবে ভুল করেছে। লাউসেন কর্পূরের ভুল ভাঙ্গানোর জন্য যখন জলে নামে তখন একটি কুমির লাউসেনের পা ধরে টানাটানি করতে থাকে। লাউসেন ধর্মের কৃপায় এবং দেবীর অসির সাহায্যে কুমীর বধ করে কুমীরের দাঁত নিয়ে নেন প্রমাণ স্বরূপ গৌড়েশ্বরকে দেখানোর জন্য।

কামদল বাঘ ও কুমীর বধ করে লাউসেন ও কর্পূর যখন জামতি নগরে এসে উপস্থিত হন, তখন কর্পূর লাউসেনকে জামতি নগর সম্বন্ধে বলে যে, এই স্থান চোর-ডাকাতহীন, সম্পূর্ণ নিরাপদ স্থান, তবে এই দেশের প্রধান সমস্যা অসতী নারীর বসবাস। তাঁরা পুরুষের বশ নয়, তাঁরা পর পুরুষ দেখলেই রতি কামনা করে। একথা শুনে

লাউসেন ও কর্পূর দুই ভাই মিলে জামতি নগরে প্রবেশ করে সরোবরের তীরে বসে শোভা উপভোগ করতে থাকে এবং সেখানে নগরের নারীরা সবাই উপস্থিত হয় ও দুই ভাইয়ের রূপ দেখে পতিনিন্দা শুরু করে। জামতি নগরের নারীদের মধ্যে শিবা বারুই-এর স্ত্রী নিয়ানী মনোহর রূপ ধারণ করে লাউসেনকে বশ করে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির কথা জানায় লাউসেনকে, কিন্তু লাউসেন তাঁর কথায় রাজী না হয়ে তাঁকে কিছু উপদেশ দেন। নয়ানী লাউসেনের কাছে প্রত্যাখাত হয়ে নিজের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য কুবুদ্ধি করে নিজের শিশুপুত্রকে হত্যা করে তার দোষ লাউসেনের উপর চাপিয়ে দেয়। জামতি নগরের রাজা লাউসেনের দোষের কথা লোকমুখে শুনে লাউসেনকে বন্দী করে তাঁর বুকের উপর জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দেন। মুমূর্ষ লাউসেন তখন ধর্মের শরণাপন্ন হয়। ধর্মঠাকুর তখন হনুমানকে অনুরোধ করে লাউসেনকে মুক্ত করার জন্য। হনুমান তখন বন্দীশালে গিয়ে ধর্মঠাকুরের কথা মতো লাউসেনকে মুক্ত করেন এবং রাজাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেন লাউসেনকে মুক্ত করার জন্য। রাজা তখন লাউসেনকে মুক্ত করে তাঁর চরণ বন্দনা করেন। লাউসেন মুক্ত হয়ে নয়ানীর মিথ্যা অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য ধর্মের কৃপায় মৃত শিশুর প্রাণ ফিরিয়ে দিয়ে সেদিনের ঘটনার কথা শিশুকে জিজ্ঞাসা করেন। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করে লাউসেন ও কর্পূর গৌড়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে গোলাঘাটে গিয়ে উপস্থিত হন। গোলাঘাটে প্রবেশ করে দুই ভাই প্রথমে হীরামালিনীর সাক্ষাৎ পায় এবং তাঁর কাছ থেকে ফুলের মালা কেনে ধর্মঠাকুরের পূজা করার জন্য। লাউসেন হীরার কাছে আতিথ্য কামনা করলে হীরা তাঁদেরকে নিজের গৃহে নিয়ে আসেন এবং হীরার মালাকার স্বামী তাদের আপ্যায়ন করে নগরের নটী সুরিক্ষা সম্বন্ধে সাবধান করে দেন। তবে হীরার সই ভাজন বুড়ি লাউসেনের রূপ দেখে মোহিত হয়ে নিজের বয়স ভাঁড়িয়ে শোলার অলঙ্কার পরে লাউসেনকে ছলনা করার জন্য সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। ভাজন বুড়ি পরিচয় পেয়ে লাউসেনকে নাতি সম্বোধন করে বিলাস করার বাসনা প্রকাশ করে এবং কর্পূর একথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে বুড়িকে চড় মেরে বসে। ভাজন বুড়ি এরপর লাঠি নিয়ে তারা করলে লাউসেন ও কর্পূর গোলাঘাটের আরো ভিতরে প্রবেশ করে, এখানেই জামতি পালা শেষ হয়।

গোলাঘাট পালার রাণী প্রধান বেশ্যা সুরীক্ষা বাণেশ্বর। কর্পুরের কাছে অপমানিত হয়ে ভাজন বুড়ি গোলাঘাটে গিয়ে সুরিক্ষার কাছে লাউসেন ও কর্পুরের রূপ বিষয়ে অবহিত করে। ভাজন বুড়ির কাছে লাউসেন ও কর্পূরের রূপের কথা শুনে সুরীক্ষা তার দুই প্রিয় দাসী সনকা ও গুরীক্ষাকে পাঠায় তাদেরকে ছলনা করে রাজপুরে আনার জন্য। আদেশ পেয়ে দুই দাসী ছলনা করার জন্য পথের মধ্যে এসে উপস্থিত হয়ে লাউসেন ও কর্পূরকে

দেখে পান খেতে দেন। কিন্তু কর্পূর অপরিচিত নারীদের কাছ থেকে পান না খাওয়ার কথা বলে মহাভারতের উর্বশীর কাছে অর্জুনের ঠকে যাওয়ার কথা বলেন, তবে ধর্মের বরে বলীয়ান লাউসেন তার উল্টো ভেবে বলে পান খেলে যুদ্ধে জয় সম্ভব। কিন্তু তাঁরা নারীদের কাছ থেকে পান না খেয়ে গৌড়ের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যেতে থাকলে দুই দাসী তাদের পথ অবরুদ্ধ করে তাদের আলিঙ্গন প্রার্থনা করে, তা না হলে টাকাকড়ি প্রদানের কথা বলে। কিন্তু লাউসেনের অলৌকিক মহিমা দেখে দাসীরা ছুটে গিয়ে সুরীক্ষার কাছে সব জ্ঞাপন করে। তখন সুরীক্ষা ছলনা করবেন বলে ঠিক করে দুই দাসীকে সঙ্গে করে লাউসেন ও কর্পূরের সামনে উপস্থিত হয়ে তাদের পরিচয় জানতে চায়। সুরীক্ষা তাদের পরিচয় পেয়ে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে তাঁর মিলন বাসনার প্রার্থনা করে। লাউসেন তখন কটূকথা শুনিয়ে সুরীক্ষাকে মাতৃ সম্বোধন করে মুক্তি পেতে চেয়েছে। মা সম্বোধন শুনে সুরীক্ষা পিছু হটলেও লাউসেনকে জব্দ করার জন্য নানা ফন্দি করতে থাকে। সুরীক্ষা লাউসেনকে একটি হেঁয়ালির সমাধান করতে বলে এবং সেই সঙ্গে এও বলে যদি হেঁয়ালির সমাধান না করতে পারে তবে তাঁকে গোলাঘাটে কারাগারে বন্দী হতে হবে। সুরীক্ষার হেঁয়ালিটি ছিল "কাঙুরের কামিখ্যা কামিনী রূপে আইসে। / সর্বাঙ্গ থাকিতে নারীর ধাউত কোথা বৈসে।।"[৮] লাউসেন বহু চেষ্টা করেও হেঁয়ালির উত্তর দিতে না পারায় সুরীক্ষা শর্ত মতো লাউসেনকে কারাগারে বন্দী করে। লাউসেন বন্দী অবস্থায় ধর্মের শরণাপন্ন হয় এবং ধর্মঠাকুর হনুমানকে পাঠায় লাউসেনকে মুক্ত করতে। হনুমান হেঁয়ালীর উত্তর খুজতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের কাছে যায়, কিন্তু তাদের কাছে হেঁয়ালির উত্তর পান না। তখন মহেশ্বর বলেন তিনি গৌরীর কাছ থেকে উত্তর শুনে আসবে। হনুমান তখন শ্বেত মাছির রূপ ধারণ করে হেঁয়ালির উত্তর শুনে হনুমান বন্দীশালায় লাউসেনের কাছে এসে তাঁকে হেঁয়ালির উত্তর জানিয়ে দেন। লাউসেন তখন সুরীক্ষাকে ডেকে হেঁয়ালির উত্তর দিয়ে বন্দীদশা থেকে মুক্ত হন। সুরীক্ষাকে পরাজিত করে লাউসেন ও কর্পূর বালিঘাট পশ্চাতে ফেলে ভৈরবী নদি পার হয়ে রমতি নগরে উপস্থিত হয়। সেখানে তাদের সাথে দেখা হয় লাউদত্ত কর্মকারের সঙ্গে এবং দুই ভাই তাঁর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহন করে। গোলাঘাটের কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে এখানেই।

হস্তীবধ পালায় আমরা লাউসেনের হস্তীবধ ও তাঁর মহিমার কথা জানতে পারি। লাউসেন ও কর্পূর রমতি নগরে লাউদত্তের গৃহে আশ্রয় নেওয়ার পর চারদিকে গুঞ্জন ওঠে যে, লাউদত্তের বাড়িতে দুইজন সুদর্শন যুবক এসেছে। মহামদ ওই সময় রাজদরবার থেকে নিজের বাড়ি ফিরছিলেন এবং জনরব শুনে সে লাউদত্তের বাড়িতে গিয়ে দেখে লাউসেন ও কর্পুর সেখানে বসে আছে। তখন মহামদ বাড়ি না ফিরে সে রাজদরবারে

ফিরে চক্রান্ত করে যে তাঁর ভাগ্নেদের চুরির অপবাদ দিয়ে তাদের শাস্তি দেবেন এবং সেই সঙ্গে এও ঘোষনা করলেন রাজার অনুমতি ছাড়া কেউ ভিন দেশের লোককে আশ্রয় দিলে রাজার কাছে তাঁর বিচার করে তাঁকে শাস্তি দেওয়া হবে। একথা শোনার পর দুই ভাই লাউদত্তের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাছতলায় আশ্রয় নিয়ে রাত কাটান। রাতে মহামদের নির্দেশে কোটাল লাউসেনের নিকট হস্তী বেঁধে রেখে লাউসেনকে চুরির অপবাদে ধরে নেয় এবং মহামদের নির্দেশে লাউসেনের উপর নানারকম নির্যাতন করতে থাকে। আর এদিকে কর্পূর পালিয়ে গিয়ে ময়রাণীর বাড়িতে আশ্রয় নেয়। ধর্মঠাকুর লাউসেনের উপর কোটালের অত্যাচার দেখে তাঁর দয়া হয় এবং তিনি হনুমানকে পাঠান লাউসেনকে মুক্ত করার জন্য। হনুমান গৌড়ে উপস্থিত হয়ে রাজাকে স্বপ্নে মহামদের ষড়যন্ত্র ও লাউসেনের প্রকৃত পরিচয় দিয়ে তাঁকে মুক্ত করতে বলেন। এরপর গৌড়েশ্বর স্বপ্নাদেশ পেয়ে লাউসেনকে মুক্তি দেন এবং তাঁর পরিচয় জিজ্ঞাসা করে। মহামদ লাউসেনের পরিচয় পেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে লাউসেনকে বিপদে ফেলার জন্য গৌড়ের পথের নিশানা দেখাতে বলেন। লাউসেন এরপর সমস্ত বিবরণ দিয়ে গৌড়েশ্বরকে সন্তুষ্ট করে। মহামদকে বলে ভাগিনেয়কে বরণ করার জন্য। মহামদ তখন আরো ক্রুদ্ধ হয়ে মদমত্ত হস্তীর সাথে যুদ্ধ করে লাউসেনকে নিজের মহিমা প্রকাশের কথা বলেন। লাউসেন মহামদের কথামতো মদমত্ত হস্তীর সঙ্গে বীরের সহিত যুদ্ধ করে হস্তীকে বধ করেন এবং মাহুতকে পরাজিত করেন। এতেও মহামদ খুশি না হয়ে বলেন যে, মৃত হস্তীকে বাঁচাতে পারলে তবেই তাঁর মহিমা প্রতিষ্ঠিত হবে। লাউসেন তখন ধর্মঠাকুরকে স্মরণ করে মৃত হস্তীকে বাঁচিয়ে তোলেন। গৌড়েশ্বর লাউসেনের বীরত্বে ও মহিমায় খুশি হয়ে পছন্দ মতো ঘোড়া বা অশ্ব দিয়ে তাঁকে ময়নার অধিপতি হিসেবে স্বীকৃতি দিলেন। লাউসেন অশ্ব পছন্দ করতে গিয়ে মর্ত্যে অভিশপ্ত সূর্যের ঘোড়া অণ্ডির পাথরকে প্রার্থনা করেন গৌড়েশ্বরের কাছে। হস্তীবধ পালায় মহামদের ষড়যন্ত্র ও লাউসেনের বীরত্বকে প্রকাশের জন্য কাহিনীকে বিন্যস্ত করেছেন রূপরাম, যা যথাযথ ও কাব্যের পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে। রূপরামের ‘ধর্মমঙ্গল’ কাব্যে এই পালার সংযোজন কাহিনীর বৈচিত্র্যকে সঙ্গতি দান করেছে।

হস্তীবধ পালায় মদমত্ত হাতীকে পরাজিত করে লাউসেন ও কর্পূর দুজনে ঘরে ফেরার বাসনা প্রকাশ করে। কিন্তু মহামদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে লাউসেন কামরূপ রাজের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এই পালায়। লাউসেন ও কর্পূর গৌড়েশ্বর সহ গৌড়ের সমস্ত লোকেদের বিশ্বাস অর্জন করে অণ্ডির পাথর নামক ঘোড়ায় চড়ে গৌড় থেকে রমতি নগরের দিকে যাত্রা করার সময় লাউসেন চারিদিক নিরীক্ষণ করতে গিয়ে কালুডোমকে দেখতে পায়, সে শূকর চরাচ্ছে এবং বাটুল গুলতি নিয়ে পশু

শিকার করছে। কালুর বাটুলের আঘাতে মরে যাওয়া পাখির মুখে গঙ্গা জল দিয়ে তাঁর প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়ে কালুর পরিচয় নেয় লাউসেন। কালু নিজের পরিচয় দিলে লাউসেন তাঁকে ময়নায় গিয়ে বসবাসের কথা বলেন। কালু লখাই ডুমনিকে গিয়ে বলে লাউসেন তাদেরকে ময়নায় গিয়ে বসবাসের কথা বলেন। কালুর কথামতো সবাই লাউসেনের কাছে উপস্থিত হয় এবং লাউসেন গৌড়ের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ডোম প্রজাদের পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতো তাদের ময়নায় বসবাসের ব্যবস্থা করে দেয়। এদিকে গৌড়েশ্বর বুঝতে পারেন না কেন গৌড় ছেড়ে ময়নায় চলে যাচ্ছে রাজ্যের মানুষ। কারণ অনুসন্ধান করে গৌড়েশ্বর জানতে পারেন মহামদের অত্যাচারে সবাই গৌড় ছেড়ে ময়নায় চলে যাচ্ছে। গৌড়েশ্বর মহামদকে একথা বললে মহামদ তার জ্ঞাতি, বন্ধু, ভাই সকলের সঙ্গে যুক্তি করে কপট করে বলেন কামরূপ রাজ কর্পূরধল গৌড় রাজ আক্রমণ করেছে বলে রব তুললেন। গৌড়ের প্রজারাও মহামদের কথার সত্যতা বিচার না করে গৌড় ছেড়ে পালাতে লাগলেন। এমন অবস্থায় গৌড়েশ্বর ভয় পেয়ে মহামদকে ডেকে পাঠালে মহামদ তাঁর কূটনীতি সফল করার জন্য গৌড়েশ্বরকে বলেন লাউসেনকে কামরূপ রাজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। গৌড়েশ্বরের পত্র পেয়ে লাউসেন কাঙুর যাত্রা করেন। লাউসেন তখন রঞ্জাবতীর কথা না শুনে সে কালু সহ তের জন দলুইকে সঙ্গে করে অণ্ডির পাথর ঘোড়ায় চেপে লাউসেন কাঙুর যাত্রা করে এবং দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে গণ্ডকী নদীর তীরে এসে উপস্থিত হয়। কিন্তু লাউসেনের পক্ষে গণ্ডকী নদী পার করা সম্ভব হবে না তখন ধর্ম হনুমানকে নির্দেশ দেন লাউসেনকে নদী পার করে দেওয়ার জন্য। হনুমান এসে লাউসেনকে বলেন যে, ধর্মপালের স্ত্রী বল্লভার কাটারি দিয়ে নদীর জল শুকিয়ে নদী পার হওয়া যাবে। সেই মতো লাউসেন বল্লভার কাটারি এনে গণ্ডকী নদীর জল শুকিয়ে নদী পার হয়ে সৈন্য সামন্ত নিয়ে কাঙুর পৌছান। এখানেই পালা সমাপ্তি ঘটে।

কাঙুরে পৌছে কালু তার দলুই সঙ্গী ও লাউসেনকে নগরের বাইরে রেখে নিজে ব্রহ্ম্যচারীর বেশে নগরে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। কালু নগরে অবস্থিত দেবী ভবানীর মন্দিরে পূজা দেন এবং দেবী কালুকে চিনতে পেরে কালুকে সাহায্য করার জন্য কাঙুর ছেড়ে কৈলাসে চলে যান। এরপর ছদ্মবেশী কালু নগরের কোটালের নজরে পরে যায় এবং নগর কোটালের সঙ্গে যুদ্ধ করে নগর কোটালকে পরাজিত করে। পরাজিত নগর কোটাল রাজাকে কাছে সমস্ত ঘটনা জানালে কালুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করে পরাজিত হন এবং লাউসেনের বশ্যতা স্বীকার করে সারা বছর ধরে কর ও নিজের কন্যার সঙ্গে বিয়ে দেওয়ার জন্য অঙ্গীকার বদ্ধ হয়। লাউসেন একথা শুনে কাঙুর রাজাকে বন্ধন মুক্ত করে এবং নগরে প্রবেশ করে তাঁর বীরত্বের কথা, যুদ্ধে আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু ও তাদের বিয়ের

কথা জানান। কিন্তু কলিঙ্গা বুদ্ধি করে তাঁর পিতাকে জানান যে এমন অবস্থায় কিভাবে কন্যাদান করবেন, তাই বিয়ে একবছর পিছিয়ে দিতে বলেন। কিন্তু কালুর উপস্থিত বুদ্ধিতে লাউসেন ধর্মের কৃপায় মৃত ব্যক্তিদের জীবিত করে কলিঙ্গাকে বিয়ে করেন। কলিঙ্গা বিভা পালায় আমরা দেখতে পাই যে লাউসেন অপ্রতিরোধ্য অজেয় বীরে পরিণত হয়। কারণ স্বরূপ দেখা যায় যে, যে গৌড় রাজের কাছে কাঙুর রাজ বীভিষীকা ছিল সেই কাঙুর রাজাকে পরাজিত করে লাউসেন এবং রাজা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করে নিজের কন্যার সঙ্গে বিয়ে দেন লাউসেনের। লাউসেনের বীরত্ব প্রকাশে এই পালাটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

কাঙুর জয় করে লাউসেন গৌড়ের আশীর্বাদ ও স্বীকৃতি আদায় করে দলবল, স্ত্রী কলিঙ্গাকে নিয়ে ময়নায় ফিরে গিয়ে সুখে জীবনযাপন করতে থাকে । লাউসেনের মর্ত্যে জন্মের প্রকৃত কারণ ধর্মের পূজা প্রচার করা। লাউসেন একথা ভুলে গেলে ধর্মঠাকুর উদ্যোগ নেয় লাউসেন যেন মর্ত্যে তাঁর পূজা প্রচার করে। ধর্মঠাকুর তখন স্বর্গের বিদ্যাধরীকে ছদ্মবেশী নটী রূপে আবির্ভূত হয়ে গৌড়েশ্বরের রাজসভায় গিয়ে নৃত্য করতে বলেন। গৌড়েশ্বর নটীর নৃত্য দেখে তাঁকে ভজনা করার বাসনা প্রকাশ করেন। রাজাকে শান্ত করার জন্য মহামদ সিমুলার অধিকারী হরিপালের মেয়েকে বিয়ে করার কথা বলেন। গৌড়েশ্বর তখন মহামদের কথা অনুযায়ী হরিপালের কন্যার পাণি গ্রহণের জন্য ভাটকে দিয়ে প্রস্তাব পাঠান। কিন্তু কানাড়া গৌড়েশ্বরের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ভাটকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে গৌড়েশ্বর সসৈন্যে সিমুলা অভিযান করেন। এতে রাজা হরিপাল ভয় পেয়ে গৌড়েশ্বরকে বিয়ে করার কথা বলেন কানাড়ার কাছে। কিন্তু কানাড়া জবাব দেয় সে গৌড়েশ্বরকে নয়, সে ময়নার রাজা লাউসেনকে বিবাহ করবে। কানাড়া গৌড়ের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দেবী ভবানীর শরণাপন্ন হন। দেবী তাঁকে লৌহগণ্ডার উপহার দেন এবং বলেন যে এক কোপে যে লৌহগণ্ডার দ্বখণ্ডিত করবেন তাঁকেই বরমাল্য দেবেন। কিন্তু গৌড়েশ্বর লৌহগণ্ডার দ্বিখণ্ডিত করতে না পারলে মহামদ লাউসেনকে বিপদে ফেলার জন্য ময়না নগর থেকে লাউসেনকে আনানোর প্রস্তাব দেন গৌড়েশ্বরকে। গৌড়েশ্বরের প্রস্তাব মত ইন্দেমেটে কে পাঠানো হয় লাউসেনকে আনানোর জন্য। রূপরাম এখানেই লৌহগণ্ডার পালা সমাপ্ত করেন।

কানাড়া বিভাপালায় কানাড়ার বিবাহ ও লাউসেনের লৌহগণ্ডার দ্বিখণ্ডিত করার বিস্তৃত বিবরণ আছে। গৌড়েশ্বর লৌহগণ্ডার দ্বিখিণ্ডিত করতে ব্যর্থ হলে মহামদ লাউসেনের কথা বলেন গৌড়েশ্বরের কাছে। লাউসেন সিমুলায় উপস্থিত হয়ে গৌড়েশ্বরকে বলেন তাঁর সভায় বারভুঞাদের মতো বীর থাকতে কেন লাউসেনকে এই গুরু দায়িত্ব দিচ্ছেন।

লাউসেন তখন গৌড়ের কথায় লৌহগণ্ডার বধ করতে সম্মত হয়। মহামদ লাউসেনকে অপমান করে বলেন তাঁকে কানাড়ার বরমাল্য পরার জন্য এখানে নিয়ে আসা হয়নি, তাঁকে আনা হয়েছে গৌড়েশ্বর ও কানাড়ার বিবাহে সাহায্য করার জন্য। মহামদ মন্ত্রণা করে লাউসেনকে বাঁশডিহার গড়ে পাঠিয়ে দেন এবং সেই সুযোগে গৌড়েশ্বর বাঁশডিহা আক্রমণ করে। কানাড়া ভীত হয়ে দেবী ভবানীর শরণাপন্ন হয় এবং দেবী তাঁকে বলে গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে ধুমসী দাসীকে যুদ্ধে পাঠাতে। ধুমসীর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয়ের ভাবনায় গৌড়েশ্বর গৌড় পলায়ন করে। বাঁশডিহা গড়ে রাজা হরিপালকে জয় করে লাউসেন কালুর কথায় সিমুলা ফিরে আসেন। এদিকে কালু সিমুলা গড় আক্রমণ করে এবং ধুমসী দাসী রণে ভঙ্গ দেয়। তখন কানাড়া আবার দেবীর শরণাপন্ন হয়। এরপর লাউসেন কানাড়াকে বিয়ে করে নিজের দলবল নিয়ে ময়নায় ফিরে আসে, এখানেই পালা সমাপ্তি ঘটিয়েছেন রূপরাম। রূপরাম কানাড়া বিভাপালাকে দ্বন্দ ও জটিল করে সাজিয়ে তুলেছেন।

রূপরামের 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের অনুমৃতা পালায় লাউসেনের প্রতি মহামদের কুটিল চক্রান্তের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। মহামদ লাউসেনকে বধ করার জন্য চক্রান্ত করে গৌড়েশ্বরকে বলেন যে, তাঁর অর্থে লাউসেন ময়নায় সুখে সংসার করছে; অথচ লাউসেনের মতো বীর থাকতে ইছাই কে পরাজিত করতে পারছি না। ইছাই গৌড়ের বশ্যতা স্বীকার না করে নিজেকে স্বাধীন রাজা করে রেখেছে। ইছাইকে পরাজিত করলে ঢেকুর গৌড়ের অধীনে চলে আসবে। মহামদের এই চক্রান্তে বিভ্রান্ত হয়ে গৌড়েশ্বর লাউসেনকে গৌড়ে ডেকে পাঠায়। কালু ও অণ্ডির পাথর অশ্বের সঙ্গে আলোচনা করে লাউসেন ঢেকুর জয় করার জন্য পিতা মাতার কাছে বিদায় নিতে গেলে লাউসেন বাঁধা প্রাপ্ত হন। কেননা ইছাই কর্ণসেনের ছয় পুত্রকে বধ করেছিলেন। তবে লাউসেন পিতা-মাতাকে আশ্বস্ত করে স্ত্রীদের কাছে বিদায় নিয়ে ঢেকুরগড় আক্রমনের জন্য গৌড়েশ্বরের কাছে উপস্থিত হয়। লাউসেন গৌড় রাজকে বলেন আপনি যেখানে তিনবার পরাজিত হয়েছেন, সেখানে আমি কিভাবে জয়লাভ করব। কিন্তু লাউসেনের কথা শুনে মহামদ তাঁকে তিরস্কার করে। এরপর লাউসেন অপমানিত হয়ে দলবল নিয়ে ঢেকুর আক্রমণের উদ্দেশ্যে অজয় নদীর তীরে এসে উপস্থিত হয়। নদীতে হাটু জল দেখে আনন্দিত হয়ে নদী পার হতে গেলে ভেসে যাওয়ার অতিক্রম হয়। লাউসেন কালুর শরণাপন্ন হয়। কালু তখন অজয়ের বুকে মাছ ধরতে শুরু করে তা ঢেকুরের রাজা ইছাইয়ের কানে আসলে তিনি লোহাটা বজ্জর কে কারণ অনুসন্ধান করতে পাঠান। লোহাটা বজ্জর কালুর পরিচয় পেয়ে কালুকে তাঁর পূর্বের কাজের জন্য কটূকথা বললে কালু অপমানিত হয়ে লোহাটা বজ্জরকে যুদ্ধে পরাজিত করে তাঁর কাটা মুণ্ড লাউসেনের কাছে নিয়ে আসে। লাউসেন তখন কালুকে বলে এই কাটা মুণ্ড তাদের

বীরত্বের স্মারক হিসাবে গৌড়ের কাছে পাঠাতে। গৌড়ে সেই কাটা মুণ্ড পাঠালে মহামদ গৌড়ের কামিল্যাদের দিয়ে লাউসেনের মায়ামুণ্ড নির্মাণ করে ময়নায় পাঠায়। লাউসেনের কাটামুণ্ড দেখে রঞ্জাবতী প্রাণঘাতী হতে চেয়েছে। লাউসেনের স্ত্রীরা সকলেই অনুমৃতা হওয়ার আয়োজন করে তখন ধর্মঠাকুর বিচলিত হয়ে ভিখারী ব্রাহ্মণ বেশে ময়নায় উপস্থিত হয়ে লাউসেনের অঙ্গুরী দেখিয়ে তাদের নিরস্ত করেন লাউসেন মারা যায়নি। অন্যদিকে অজয় নদী লাউসেন পার করতে পারছে না দেখে ধর্মঠাকুর হনুমানকে পাঠিয়ে লাউসেনকে অজয় নদী পার করিয়ে দেন। এখানেই সমাপ্তি ঘটে অনুমৃতা পালার।

লাউসেন ঢেকুর গড়ে সসৈন্যে উপস্থিত হলে তার আয়োজন দেখে ভীত হয়ে ইছাই দেবী ভবানীর শরণাপন্ন হন। ইছাই বধ পালায় লাউসেনের ইছাই ঘোষকে বধ করার কাহিনী রূপরাম বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করেছেন। ইছাই পার্বতীর আরাধনা করে দেবীর বাণ পেয়ে প্রথমেই ইছাই কালুর বিরুদ্ধে অভিযানে নামেন। ইছাইয়ের বাণের আঘাতে কালু যুদ্ধে মৃতপ্রায় হয়ে গেলেন। লাউসেন তখন ধর্মের শরণাপন্ন হয় এবং দেবতারা ধর্মের পুস্পজল দিয়ে কালুর প্রাণ ফিরিয়ে দেন। এরপর লাউসেন ইছাইয়ের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, তাদের মধ্যে প্রবল যুদ্ধ হয়। লাউসেনের ফলার আঘাতে ইছাইয়ের মাথা ভূমিতে গড়িয়ে পরলেও জয়দুর্গা উচ্চারণ করলেই দেবী সন্তুষ্ট হয়ে ইছাইয়ের ধরে কাটা মুণ্ড স্থাপন করে তাঁকে পুনরায় জীবিত করে তুলেন। ইছাই দেবীর বরে অমরত্ব লাভ করেছে। ইছাই অপরাজেয় হলে মর্ত্যে ধর্মের পূজা হবে না । তখন দেবতারা বললেন লাউসেন ইছাইয়ের মাথা কাটলে হনুমান তা নিয়ে পাতালে ফেলবেন। কিন্তু দেবী বাসুকীর কাছ থেকে মাথা চেয়ে নিয়ে ইছাইকে পুনর্জীবন দান করেন। এরপর নারদের কটাক্ষে দেবী যখন নারদের পিছনে ধাওয়া করে কিছুক্ষণের জন্য স্বর্গে গেলে দেবতারা লাউসেনকে আদেশ দেন ইছাইকে বধ করতে। দেবতারা তখন হনুমানকে নির্দেশ দেন ইছাইয়ের কাটামুণ্ড নিয়ে গিয়ে কৃষ্ণের পদতলে রাখতে। এতেই ইছাই মুক্তি পায়। দেবী ভবানী ইছাইয়ের এই পরিণাম দেখে দুঃখিত হয়ে বলেন তিনি লাউসেনকে হত্যা করে তাঁর প্রতিশোধ নেবেন। লাউসেন তখন দেবীর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে পূর্বে প্রদত্ত ফলা দেখিয়ে দেবীকে শান্ত করেন। রূপরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে এই পালাটির সংযোজন বেশ তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা লাউসেন ঢেকুর গড় জয় না করলে গৌড়ে লাউসেনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং মহামদের জয় হবে। লাউসেনের দ্বারা মর্ত্যে ধর্মের পূজা প্রাপ্তি হবে না। কাহিনীকে পরিণাম অভিমুখী করে তোলার জন্যই এই পালার সংযোজন করা হয়েছে। সুতরাং, কাহিনী লক্ষ্যের দিক থেকে এবং স্বর্গ-মর্ত্যের ব্যবধান ঘোচানোর কারনেই এই পালা

সংযোজন। আমরা দেখি দেবী ভবানী স্বর্গ থেকে ফিরে এসে লাউসেনকে বর প্রদান এবং জামাতা হিসেবে গ্রহণ করার মধ্য দিয়ে মর্ত্যের ধূলিমাটির স্পর্শ পাওয়া যায়।

এর পরবর্তী পালা অঘোরবাদল পালা। এই পালায় মহামদ ধর্ম পূজার আয়োজন করেন। মহামদ লাউসেনের মহিমায় ঈর্ষান্বিত হয়ে ভাবেন ধর্ম পূজা করেই যখন লাউসেনের এতো শক্তি, তখন মহামদ ধর্মের পূজা করে লাউসেন বধের বর চাইবেন। মহামদের কথামতো গৌড়েশ্বর ধর্মপূজার আয়োজন করলেও মহামদ মন থেকে অসৎ ইচ্ছাকে পরিত্যাগ করতে পারেনি। ধর্মঠাকুর মহামদের অসৎ ইচ্ছার কথা জানতে পেরে হনুমানের সঙ্গে পরামর্শ করে মহামদকে শাস্তি দেবার জন্য গৌড়ে অকাল বর্ষা সৃষ্টির জন্য ইন্দ্রের কাছে অনুরোধ করেন। ইন্দ্র প্রদত্ত প্রবল ঝড়, বৃষ্টিতে গৌড়ের প্রবল ক্ষয় ক্ষতি হয়, মন্দির ভেঙ্গে যায়, জমির ফসল নষ্ট হয়। গৌড়েশ্বর তখন ভয় পেয়ে মহামদের শরণাপন্ন হলে মহামদ পরামর্শ দেন ময়না থেকে লাউসেনকে আনিয়ে ঝড়-বৃষ্টি বন্ধ করার জন্য। লাউসেন ময়না থেকে এসে গৌড়ে উপস্থিত হলে রাজা তাকে পশ্চিম উদয়ের কথা বলেন। লাউসেন সম্মত না হওয়ায় মহামদ তাকে বন্দী করেন। লাউসেন তার বন্দী দশার খবর কর্পূর পাতরের মাধ্যমে ময়নায় তার পিতা-মাতাকে জানিয়ে তাদের গৌড়ে নিয়ে আসতে। লাউসেনের পিতা-মাতা গৌড়ে উপস্থিত হলে লাউসেন তাদের পশ্চিম উদয়ের কথা বলেন। রঞ্জাবতী তখন মহামদকে বলে নিজে বন্দী হয়ে লাউসেনকে মুক্ত করে তাঁকে হাকন্দে গিয়ে হরিহর বাইতি এবং সামুলা আমিনির সাহায্যে ধর্মঠাকুরের পূজা করে পশ্চিমে সূর্য উদয়ের কথা বলেন। হাকন্দে ধর্মের দেহারা দেখে সামুলা লাউসেনকে বলেন পূর্বে এখানে হাকণ্ড ভুবন স্বর্গপুরী হলেও এখন সেখানে ধর্মের পূজা না হওয়ায় তা বেনাবনে পরিণত হয়েছে। লাউসেন এ কথা শুনে নফর ইছারানাকে দিয়ে জঙ্গল পরিস্কার করিয়ে হাকন্দ ভুবনকে পুনরায় ধর্মের গাজনের উপযোগী করে তুলেন। এখানেই অঘোরবাদল পালা সমাপ্ত হয়।

অঘোরবাদল পালার পর জাগরণ পালা। জাগরণ পালার দুটি দিক বা কাহিনী দুটি প্রসঙ্গকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। একদিকে লাউসেনের অনুপস্থিতিতে মহামদের ময়নাগড় আক্রমণ এবং অন্যদিকে হাকন্দ ভুবনে ধর্মপুজা করে লাউসেনের পশ্চিমে সূর্যোদয় ঘটানো। লাউসেন হাকণ্ড ভুবনে ধর্মপূজা করে পশ্চিমে সূর্যোদয়ের জন্য ব্যস্ত তখন মহামদ সেই সুযোগ নিয়ে ময়না আক্রমণ করেন। মহামদ ময়নার নিকট পদ্মমায় শিবির স্থাপন করে ইন্দ্রজালকে ময়নার সংবাদ আনতে পাঠালেন। ইন্দ্রজাল ময়নায় গিয়ে নিদ্রা দেবীর মন্ত্র পরে সকলকে ঘুম পারিয়ে ময়না ঘুড়ে এলেন এবং মহামদের ময়না আক্রমণের প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। এদিকে ময়নার বিপদের কথা বুঝে ধর্মঠাকুর হনুমানকে বলেন

কালুকে স্বপ্ন দেখাতে। কালু তখন হনুমানের স্বপ্ন পেয়ে লখ্যাকে ময়না রক্ষার ভার দিয়ে নিজে পার্বতীর পূজা শরু করেন। কিন্তু কালু মদ্যপান করায় দেবী তার প্রতি রুষ্ট হয়ে তাঁর বংশ নাশের অভিশাপ দেন। দেবীর অভিশাপে কালুর বুদ্ধি নাশ হলে কাজে অবহেলা শুরু করেন কালু। মহামদ কালুর স্ত্রী লখ্যাকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে নিজের দিকে করতে চেয়েছে। কিন্তু লখ্যা দেবী ভবানীর পূজা করে মহামদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মহামদকে পরাজিত করে। যুদ্ধ জয় করে লখ্যা স্বামীকে বলেন মহামদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে, কিন্তু দেবীর অভিশাপ থাকায় কালু আর যুদ্ধে গেল না। মহামদ পুনরায় ময়না আক্রমণ করেন। লখ্যা প্রথমে তাঁর সতীন সনকার কাছে গিয়ে বলেন তাঁরা দুজনে মিলে মহামদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, কিন্তু সনকা তাঁর প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলে লখ্যা বাধ্য হয়ে পুত্র শাখাকে যুদ্ধের কথা বলেন। শাখা মহামদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রাণ হারায় এবং কালুর অন্যান্য পুত্ররাও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে কিন্তু দেবীর অভিশাপ থাকায় তাঁরাও প্রাণ হারায় যুদ্ধে। কালু পুত্রদের অকাল প্রয়াণে অধীর হয়ে যুদ্ধে যেতে প্রস্তুত হয় এবং এই সংবাদে মহামদ ভীত হয়ে ঘোষনা করে, যে কালুর মাথা কেটে এনে দিতে পারবে তাঁকে ময়নার রাজা করে দেওয়া হবে। কালুর ভাই তখন লোভে পরে কালুর কাছে যায় এবং বলে তারা পূর্বের বৈরিতা ভুলে গিয়ে মিলে মিশে থাকবে। এই সুযোগে কালুর ভাই কালুর কাছে অঙ্গীকার করিয়ে নেয় সে যা চাইবে তাই কালুর নিকট পাবে। কালু সম্মত হলে কালুর ভাই কালুর কাটা মাথা চাইল এবং কালু শর্ত রক্ষার্থে তাঁর মাথা কেটে দিল। কালুর ভাই কাটা মাথা নিয়ে যখন মহামদের কাছে যাত্রা করে তখন লখ্যা তাকে বধ করেন। কালুর মৃত্যুতে ডোমপারা শোকে বিহ্বল হয়ে উঠলে লখ্যা লাউসেনের অন্তঃপুরে গিয়ে কলিঙ্গাকে যুদ্ধে যেতে আহ্বান করে। কলিঙ্গা মহামদের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়। কিন্তু যুদ্ধে সে প্রাণ হারায়। কলিঙ্গার মৃত্যুর পর কানাড়া দেবী পার্বতীর পূজা করেন এবং দেবী তাঁর পুজায় সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে বর দিলেন যে যুদ্ধে তিনি কানাড়াকে সাহায্য করবেন। দেবীর কৃপায় কানাড়া মহামদের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়লাভ করে মহামদকে যথেষ্ট ভাবে অপমান করেন। মহামদের অপমান এখানেই শেষ নয়, দেবীর ছলনায় তিনি নিজের ঘরে ঢুকলে চোর সন্দেহে নিজের স্ত্রী ও দাসীদের কাছেও লাঞ্ছিত হন। অন্যদিকে কানাড়া দেবীর কাছে কলিঙ্গার প্রাণ ভিক্ষা চাইলে দেবী বলেন পশ্চিমে সূর্যোদয় হলে সবাই প্রাণ ফিরে পাবে।

দ্বিতীয়াংশের কাহিনীতে দেখা যায় লাউসেন অনেকদিন ময়না থেকে দূরে থাকায় ময়নার আশঙ্কায় তিনি চঞ্চল হয়ে ওঠেন এবং শারীশুয়া পাখির দ্বারা তিনি ময়নায় পত্র পাঠান। কানাড়া লাউসেনের পত্র পেয়ে ময়নার সংবাদ জানিয়ে শারীশুয়ার মাধ্যমে লাউসেনের কাছে পত্রের উত্তর পাঠিয়ে দেন। ময়নার সংবাদ জেনে লাউসেন শোকে

ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। সামুলা আমিনি তখন লাউসেনকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন শোকে অধীর হলে তপস্যা সফল হবে না। লাউসেন তখন নিষ্ঠার সহিত ধর্মঠাকুরের পুজায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। লাউসেনের তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে ধর্মঠাকুর বর দিতে চাইলে লাউসেন ধর্মের কাছে পশ্চিমে উদয়ের বর প্রার্থনা করলেন। তখন ধর্মঠাকুরের কথামতো পশ্চিমে সূর্যোদয় হল। ধর্মঠাকুরের সামনে লাউসেন হরিহর বাইতিকে এই ঘটনার সাক্ষী রেখে গৌড় যাত্রা করেন। রূপরাম চক্রবর্তীর ঘটনাবহুল জাগরণ পালা সমাপ্ত হয় এখানেই।

লাউসেন হাকণ্ড ভুবনে পশ্চিমে সূর্যোদয়ের পর গৌড়ে এসে পিতা-মাতাকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করার জন্য বন্দীশালায় উপস্থিত হয়। রঞ্জাবতী বহুদিন পর পুত্রকে দেখেন এবং সমস্ত ঘটনার বিবরণ শুনেন। কিন্তু মহামদ এই সংবাদ শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে লাউসেনের চুল ধরে তাকে চোর অপবাদ দিয়ে লাঞ্ছনা করে। ইতিমধ্যে গৌড়ের কাছে খবর যায় লাউসেন হাকণ্ড ভুবন থেকে ফিরে কর্ণসেন-রঞ্জাবতীর সাথে সাক্ষাৎ করেছে। লাউসেন এতে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলে রঞ্জাবতীর মধ্যস্থতায় শান্ত হয়ে লাউসেন মাতুলের কাছে সমস্ত ঘটনার কথা জ্ঞাপন করেন। কিন্তু মহামদ লাউসেনের কথায় বিশ্বাস না করলে লাউসেন হরিহরকে সাক্ষী মানল। কিন্তু মহামদ হরিহরকে টাকার লোভ দেখিয়ে লাউসেনকে বিপদে ফেলতে চাইলেন, কিন্তু হরিহর সাক্ষ্য দেবার সময় সরস্বতী তাঁর জিহ্বায় ভর করায় হরিহর সত্য কথা বলে। মহামদ তখন হরিহরকে চোর অপবাদ দিয়ে বিপদে ফেলতে চাইলে ধর্মের নির্দেশে হনুমানের হস্তক্ষেপে হরিহর মুক্তি পেয়ে সর্বসমক্ষে স্বর্গে চলে গেলেন। মহামদ তা দখে ভাবলেন শূলে দিলেই স্বর্গ প্রাপ্তি ঘটবে, তাই তিনি তাঁর পুতদের একে একে শূলে দিলেন। কিন্তু তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের দেহে কোন পাপ না থাকায় সে রক্ষা পায়। এরপর মহামদের কুষ্ঠরোগ হয় এবং গৌড়েশ্বরের অনুরোধে লাউসেন ধর্মের কৃপায় মহামদের কুষ্ঠরোগ ভালো করে দিয়ে গৌড়ের সকলের আশীর্বাদ নিয়ে লাউসেন ময়নায় ফিরে আসেন। লাউসেন ধর্মের সাহায্যে ময়নার সকলকে বাঁচিয়ে তুলেন এবং মর্ত্যে ধর্মের পূজা প্রচারিত হয়। ধর্মঠাকুর তখন লাউসেনকে মর্ত্যের সমাপ্তি ঘটিয়ে স্বর্গে ফিরে যেতে বলেন এবং ধর্মের কথামতো লাউসেন স্বর্গে ফিরে গেলে ধর্মমঙ্গলের কাহিনীর সমাপ্তি ঘটে।

রূপরাম চক্রবর্তী বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে, উপকাহিনীর মাধ্যমে তাঁর কাব্যের ঘটনা ধারাকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। তাই বলা হয়ে থাকে রূপরামের ধর্মমঙ্গল কাব্য ধর্মমঙ্গল কাব্য ধারায় বিশেষ উচ্চতায় অবস্থান করছে। ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনীতে অভিনবত্ব ও ঘনত্ব দুই-ই আছে। মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের কবিরা তাদের কাব্যে দেবখণ্ডের যে বিবরণ দেয়েছেন তা মূল কাহিনীর ভুমিকা অংশ রূপে অভিহিত হয়। তবে ধর্মমঙ্গল কাব্যে এরূপ

কোন আলাদা কাহিনী নেই। মূল কাহিনীর সঙ্গে পৌরাণিক যে সমস্ত কাহিনী ব্যবহৃত হয়েছে তা প্রাসঙ্গিক কাহিনীকে পরিপুষ্ট করার জন্য, সেখানে কোন বাহুল্য নেই। রূপরাম চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী বয়নে ও উপস্থাপনায় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

রূপরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী বস্তুর পরিচয় থেকেই আমরা মধ্যযুগের সমাজ-সংস্কৃতি ও জীবনচর্চার বৈচিত্র্য অন্বেষণের পথে এগিয়ে যাবো। মধ্যযুগের দেব-দেবীর লীলা মাহাত্ম্য বিষয়ক মঙ্গলকাব্যগুলিতে সুপ্রাচীন কাল থেকেই বাংলাদেশের আদিম জনসমাজের লোকাচার ও লোকবিশ্বাস গভীর ভাবে মুদ্রিত হয়ে আছে। ড. নীহাররঞ্জন রায় এই প্রসঙ্গে বলেছেন – "এ-তথ্য সর্বজনস্বীকৃত যে, আর্য-ব্রাহ্মণ বা বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি সম্প্রদায়ের ধর্মকর্ম, শ্রাদ্ধ, বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি সংক্রান্ত বিশ্বাস, সংস্কার ও আচারানুষ্ঠান, নানা দেবদেবীর রূপ ও কল্পনা, আহার-বিহারের ছোঁয়াছুঁয়ি অনেক কিছু আমরা সেই আদিবাসীদের নিকট হইতেই আত্মসাৎ করিয়াছি। বিশেষভাবে, হিন্দুর জন্মান্তরবাদ, পরলক সম্বন্ধে ধারনা, পেততত্ত্ব, পিতৃতর্পন, পিণ্ডদান, শ্রাদ্ধাদি সংক্রান্ত অনেক অনুষ্ঠান, আভ্যুদয়িক ইত্যাদি সমস্তই আমাদেরই প্রতিবাসীর এবং আমাদের অনেকেরই রক্তস্রোতে বহমান সেই আদিবাসী রক্তের দান। হিন্দুর ধর্মকর্মের গোড়ায় এ কথাটা না জানিলে অনেকখানিই অজানা থাকিয়া যায়।"[৯] সুপ্রাচীন কাল থেকেই জনসমাজের মধ্য দিয়ে লোকাচার, লোকবিশ্বাসগুলি মঙ্গলকাব্যে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ধর্মমঙ্গল ছাড়া অন্যান্য প্রধান মঙ্গলকাব্যগুলি বাংলাদেশের সর্বত্র প্রচলিত থাকলেও ধর্মমঙ্গল কাব্য রাঢ়বঙ্গেই প্রচলিত এবং তা রাঢ়বঙ্গের কবিদের দ্বারা রচিত। সুতরাং ধর্মমঙ্গল কাব্য থেকে পাওয়া লোকাচার ও লোকবিশ্বাসগুলি সুপ্রাচীনকাল থেকেই রাঢ়বঙ্গের। রূপরাম ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে রাঢ়বঙ্গের লোকাচার ও লোকবিশ্বাস গুলিকে লিপিবদ্ধ করেছেন তাঁর কাব্যে।

যে সমস্ত প্রথা বা আচার-সংস্কার সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে তাকেই লোকাচার বলা হয়। রূপরাম তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্যে সমাজ সংস্কৃতির বর্ণনা করতে গিয়ে বিভিন্ন লোকাচার ও লোকাবিশ্বাসের বর্ণনা করেছেন। সেই বিষয় বস্তুর অন্বেষণ করাই হবে আমাদের মূল লক্ষ্য। সমাজগোষ্ঠীর দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা আনুষ্ঠানিক আচরণই লোকাচার হিসেবে পালিত হয়। তেমনি গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের ঐতিহ্যবাহী বিশ্বাসই হল লোকবিশ্বাস। লোকবিশ্বাস সেই গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের ঐতিহ্যবাহী মানসিক প্রক্রিয়া। এই লোকবিশ্বাস যুগ যুগ ধরে একটি শ্রেণির মানুষের আচরণ ধারাকে নিয়ন্ত্রন করে চলেছে। সুপ্রাচীন কাল থেকে মানুষের জীবনের অনেক ঘটনা – জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু, সামাজিক কর্তব্য ইত্যাদির সঙ্গে লোকাচার ও লোকবিশ্বাসের ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। রূপরামের কাব্যে

নবজাতকের জন্ম সম্বন্ধীয় লোকাচারে মধ্যে গর্ভবতী রমণীকে কেন্দ্র করে পালন করা অনুষ্ঠানিক রীতি রেওয়াজ এবং শিশুর জন্মের পরে পালন করা জন্মকেন্দ্রীক সংস্কার বিশ্বাসের পরিচয় পেয়ে থাকি। গর্ভবতী রমণীকে কেন্দ্র করে পালন করা সংস্কারের পরিচয় রূপরামের কাব্যে তিন রকমের -- পঞ্চমৃত সেবন, সাধভক্ষণ ও গর্ভবতী রমণীর লোকাচারের কথা বলেছেন। গর্ভবতী রমণীর তিনমাস সময়ে পঞ্চমৃত সেবন করানো হত, এই পঞ্চামৃত হল – দুধ, ছানা, ঘি, চিনি এবং মধু। রূপরাম পঞ্চামৃতের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন –

"পাঁচ মাসে পঞ্চামৃত সোমঘোষ দিল।
অন্তরে পরম গুরু সোমঘোষ হইল।।"[১০]

অথবা,

"বস্ত্র অলঙ্কার ভূষা দিবসে দিবসে।
পঞ্চামৃত রঞ্জাবতী খায় পঞ্চমাসে।।"[১১]

গর্ভবতী নারীর যখন সাতমাস বয়স অর্থাৎ মাতৃ গর্ভে সন্তানের স্পন্দন ও অস্তিত্ব অনুভূত হয় তখন খাদ্য সংক্রান্ত লোকাচার রাঢ়বঙ্গের জনসমাজে প্রচলিত ছিল, তা সাধভক্ষণ নামে পরিচিত। রূপরামের কাব্যে আমরা সমাজ-সংস্কারের ধারায় এই সাধভক্ষণের পরিচয় পাই --

"ছয়মাসে নিবড়িল সাতে প্রবেশ।
নানা সাধ খায় রামা অপূর্ব সন্দেশ।।"[১২]

এরপর আমরা দেখি যে, সাধভক্ষণের কিছুদিন পর যখন সন্তান জন্মের সময় হয়, তখন গর্ভবতীকে একটি আলাদা ঘরে রাখা হয় তাকে 'সূতিকাগৃহ' বা আঁতুরঘর বলা হয়। রূপরামের কাব্যে এই সূতিকাগৃহের পরিচয় পাওয়া যায় –

"রঞ্জাবতী রানী রহে সুতিকার ঘরে।
সভার আনন্দ গুরু সপ্তম বাসরে।।"[১৩]

রূপরামের কাব্যে আমরা দেখি গর্ভবতী রমণীদের প্রসব ক্রিয়া করানো হয় দাইয়ের দ্বারা। প্রসব ক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে নাড়ি কেটে শিশুর যথাযথ পরিচর্যা করা হয়।

"বাটা হল্য হীরা দায় বলে হাঁকারিয়া।
সাধিল আপন কাজ জয় জয় দিয়া।।"[১৪]

পুত্রসন্তান জন্মালে বাড়িতে আনন্দের ধূম পড়ে যায়, সবাই আনন্দে নাচ-গান করেন –

"নাট-গীতে আনন্দ শর্বরী জাগরণ।
কোলাহল মহোৎসব ময়না ভূবন।।"[১৫]

নবজাতকের জন্মের পর পাঁচদিনে পাচুটা করা হয়। এটিই শিশুর জন্মের প্রথম লোকাচার, জন্মের পাঁচদিন পরে পালনের কারণে এর নাম হয় পাচুটা বা পাচুট্যা। প্রসূতিকে আঁতুরঘর থেকে বের করে ঘরে তোলা হয় এবং বাড়িতে নাপিত ডেকে নখ কেটে এয়োতিকে স্নান করানো হয় –

"নিবড়িল পাঁচুটা ষষ্ঠীর আদি পূজা।
ঢেকুরেতে জন্মিল ইছাই মহাতেজা।।"[১৬]

আমরা রূপরামের কাব্যে দেখতে পাই নবজাতকের জন্মের পর ছয়দিনের দিন পালন করা হত ষেটারা বা ষষ্ঠীপূজা। রূপরাম এই অংশের বর্ণনা দিয়েছেন খুব সুন্দর ভাবে –

"কুল ক্রিয়া সকল সাধিল কুলবতী।
ছ'দিনে ষেটারা জাগরণ রাতি।।"[১৭]

তবে কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে এই নিয়ম একুশ দিনে পালন করার রীতি ছিল --

"ষষ্ঠীপূজা করিলেক একুইশ দিবসে।
দেবকন্যা অম্ববতী কুলশীল বশে।।"[১৮]

ষেটারা বা ষষ্ঠীপূজার দিন সন্তানের মায়েদের সারারাত জেগে থাকতে হত। এই রীতি পালনের মধ্য দিয়ে সমাজের লোকেদের বিশ্বাস ছিল এই দিনেই রাতে বিধাতা এসে সন্তানের ললাট লিখে দেবেন। তাই শিশুর মাথার কাছে দোয়াত কলম রাখতে হত।

শিশু সন্তানের ছয়মাস বয়স হলে মুখে ভাত বা অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান করা হত। অন্নপ্রাশনের দিনে শিশুর মুখে শক্ত জাতীয় খাদ্য তুলে দিয়ে শুভ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হত। উক্ত অনুষ্ঠানটি বেশ ধুমধাম করে পালন করা হত এবং সমস্ত জ্ঞাতি-কুটুম্ব, আত্মীয় স্বজনদের নিমন্ত্রণ করে তাদের জন্য উপযুক্ত ভোজনের ব্যবস্থা করা হত। নিমন্ত্রিতরা সকলেই শিশুকে আশীর্বাদ করে নানারকম উপহার দিতেন। রূপরামের কাব্যে আমরা এই অংশের সুন্দর পরিচয় পাই –

"ছয় মাস গত হৈল অন্ন দেই মুখে।
অঙ্গের ভূষণ যত দিলেন যৌতুকে।।"[১৯]

সন্তান বড় হয়ে পাঁচ বছর বয়সে এসে উপনীত হলে আনুষ্ঠানিকভাবে লেখাপড়ার সূচনা হত। সরস্বতী পূজার দিনে এই হাতে খড়ি অনুষ্ঠান পালন করা হত। রাঢ়বঙ্গে এই অনুষ্ঠানকে হাতেখড়ি বলা হয়ে থাকে। শিশুকে গঙ্গাজলে স্নান করিয়ে নতুন বস্ত্র পড়িয়ে সরস্বতী পূজা করিয়ে গোঁসাইয়ের হাত দিয়ে শিশুর হাতে খড়ি দিয়ে পাথরের উপর কিছু অক্ষর লেখা হত।

রূপরামের কাব্যে আমরা রাঢ়ের বিবাহ সম্পর্কিত লোকাচারের পরিচয় বিধৃত হতে দেখি। আমরা জানি পুত্রের তর্পন ছাড়া পিতার স্বর্গলাভ হয় না। দীর্ঘকাল ধরে সমাজে চলে আসা এই রীতির বশবর্তি হয়েই মানুষ বিবাহ করে থাকেন। বংশ রক্ষার তাগিদ এবং অন্যদিকে পরকালে মর্ত্য জীবনের জ্বালা যন্ত্রনা থেকে মুক্তির আস্বাদেই বাঙালি সমাজে বিবাহ ঐকান্তিক ভাবে প্রয়োজন। রুপরামের কাব্যেও আমরা এই বৈবাহিক আচারের পরিচয় পাই। রাঢ়বঙ্গের মানুষের বিশ্বাস পুত্রলাভের জন্য, বংশ রক্ষার জন্য, সমাজে মানুষের কাছ থেকে লাঞ্ছনা, অপমান ভোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এবং স্বর্গলাভের কারণেই মানুষ বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়। রূপরামের কাব্যে দেখা যায় কর্ণসেন ও রঞ্জাবতী অপুত্রক থাকায় মহামদ তাদেরকে সকলের সামনেই অপমান করে বলেন –

"পাত্র বলে অহে রাজা না কহিলে নয়।
আঁটকুড়া দর্শনে মহাপাপ হয়।।
অপুত্রক জনের দেখিতে নাই মুখ।
বদন দেখিলে তার পাই কত দুঃখ।।
পুত্র-আঁটকুড়ার মুখ কভু নাঞি চাই।
কন্যা-আঁটকুড়ার ঘরে জল নাঞি খাই।।"[২০]

সমাজে নারীরা এই সমস্যা থেকে মুক্তি লাভের জন্য নানা ব্রত, পূজার্চনা এবং অলৌকিক পথ খুঁজে বেড়াতেন। এভাবে সমাজে আমরা বিভিন্ন বিশ্বাস ও মতবাদের জন্ম নিতে দেখি। রাঢ়বঙ্গও এই সংস্কার-বিশ্বাস থেকে বেড়িয়ে আসতে পারেনি। সপ্তদশ শতাব্দী্র রাঢ়বঙ্গে রূপরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যেও আমরা বিবাহ রীতির পরিচয় পেয়েছি। রাঢ়বঙ্গে সেকালে খুব ধুমধামের সহিত বিবাহ কার্য সম্পন্ন হত। বিয়ের পাকা কথা হওয়ার পর উভয় বাড়ি থেকেই আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে ডেকে আনা হত তা রূপরামের কাব্যে পাওয়া যায় –

"শুনিঞা মহাশয় হইলা রসময়
বান্ধবে করে আমন্ত্রণ।
কুটুম্ব দ্বিজগণ আইলা নিকেতন
আজি সে সফল জীবন।।"[২১]

বিবাহ উপলক্ষ্যে নান ধরণের লোকাচার-সংস্কার পালন করা হত। লোকাচার পালনের অঙ্গ হিসাবে প্রথমেই বর-কনের অধিবাস অনুষ্ঠান পালন করা হত। অধিবাস

উপলক্ষ্যে একটি বরণ ডালা সাজানো হত। সেখানে ধান, দূর্বা, চন্দন, হরিদ্রা, ফল, ফুল, ঘি, দই, সোনা, রূপা, তামা, গোরচনা ইত্যাদি নান প্রকার দ্রব্য বরণ ডালাতে রাখা হত --

"আনিল গন্ধ শিলা স্বস্তিক পুস্পমালা
কঙ্কণ শঙ্খ ফল দধি।
যাবক গোরোচনা ধান্য রূপা সোনা
হরিদ্রা দিল যথাবিধি।।"[২২]

অধিবাস অনুষ্ঠানে পুরোহিত নানা মন্ত্র পরে অধিবাসের কাজ সম্পন্ন করেন এবং পুরোহিত তা বর ও কনের মাথায় ঠেকিয়ে আশীর্বাদ করতেন। এরপর পুরোহিত বর-কনের হাতে হলুদ মাখানো সুতো বেঁধে দিতেন এবং তার মধ্য দিয়েই নব দম্পত্তির সুখ সমৃদ্ধি কামনা করা হত।

অধিবাসের পর ষোড়শ মাতৃকা পূজা, বসুধারা দান, নান্দীমুখ অনুষ্ঠান ইত্যাদি লোকাচার পালিত হত। মাটিতে বিভিন্ন প্রকার আল্পনা দিয়ে তার উপর সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে ষোল দেবীর শক্তির পূজা করা হত। এরপর বসুধারা অনুষ্ঠানে দেখা যা, ঘরের পূর্ব বা উত্তর দিকের দেওয়ালে নাভি সমান উচ্চতায় গোবরের তাল লাগিয়ে সেখানে করি লাগিয়ে দিয়ে বসুধারা পূজা করা হত। নিজ পিতৃপুরুষকে স্মরণ করে অন্ন জল উৎসর্গের জন্য পালিত লোকাচারকে বলা হত নান্দীমুখ অনুষ্ঠান বা বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ। বিবাহ মানুষের জীবনের একটি মহৎ অনুষ্ঠান , সেখানে পূর্বপুরুষের আশীর্বাদ লাভের জন্য নান্দীমুখ লোকাচার করা হত –

"নান্দীমুখ আদি করিল যথাবিধি
হইল শুভকাজ সারা।"[২৩]

রূপরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে আমরা এরপর যে লোকাচার অনুষ্ঠানের পরিচয় পাই তা হল জলসংগ্রহ অনুষ্ঠান। সেখানে এয়োস্ত্রীরা জল চাইতে প্রথমে মন্দিরে বা কোন সরোবর থেকে জল সংগ্রহ করে বাড়ি নিয়ে আসেন। তারপরে তারা পড়শীদের বাড়িতে গিয়ে তাদের আলতা সিঁদুর, পান সুপারি দিয়ে বর-কনের জন্য আশীর্বাদ প্রার্থনা করতেন। রূপরামের কাব্যে এই অংশের মনোময় বর্ণনা রয়েছে –

"মন্দরা পাটরাণী আয়তি-সোয়া আনি
সভেহি মেলি জল সয়।
যুবতী যত জনা বরণ কাঁচাসোনা
জলকে সহিবারে যায়।।"[২৪]

রূপরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে রাঢ়বঙ্গের সমাজের বিবাহকালীন রীতিনীতির পরিচয় পাওয়া যায়। রাঢ়বঙ্গে সেই সময় কনের বাড়িতে বরযাত্রী যাওয়ার রীতি ছিল। কনের বাড়িতে বর সহ বরযাত্রী পৌছালে চাল, গুর, দই, খই, মালা ইত্যাদি দ্রব্য দিয়ে বরণ ডালা সাজিয়ে বরকে বরণ করা হত। রূপরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে বরকে বরণ করা হয় যেভাবে –

"চাল গুড় মিলায়্যা তুলিয়া রাখে ভালে।
অধর জুখিতে চায় বরণের কালে।।"[২৫]

এরপর এয়োস্ত্রীরা পান সুপারী দিয়ে বরকে নিছিয়ে নিয়ে গলায় মালা পরিয়ে বরের পায়ে দই ঢেলে দিতেন এবং এবং মুখের উপর খই ছিটিয়ে দিতেন –

"পরম হরিষে সব আয়ো-সুয়োগণ।
বিরলে আনিয়া বর করিল বরণ।।
আয়ো-সুয়োগণ লয়্যা সুন্দরী মন্দরা।
বরের সমুখে গিয়া গিয়া দিল জলঝারা।।
প্রদক্ষিণ আয়ো-সুয়োকরি সাতবার।
বর দেখ্যা বলে কেহ বয়স আপার।।
সমুখে ধরিল দাসী বরণের ডালা।
নিছিয়া পেলিল পান গলে দিয়া মালা।।"[২৬]

বরণ করার পর বরকে সকলে মিলে ছাঁদনা তলায় নিয়ে যেত।

বরকে ছাঁদনা তলায় নিয়ে যাওয়ার পর পালিত হত বিবাহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লোকাচার সাতপাক ঘোরা। সাতপাকের সঙ্গেই মালাবদল ও শিভদৃষ্টী সম্পন্ন হত। বিবাহকালীন লোকাচারে আমরা দেখতে পাই সাতপাক ঘোরানোর সময় কনেকে একটি কাঠের পিড়ির উপর বসিয়ে নিয়ে কন্যার বাড়ির জামাতাগণ ছাঁদনাতলায় দণ্ডায়মান বরের চারপাশে দক্ষিণ দিক থেকে সাতবার প্রদক্ষিণ করত। এরপর কনেকে বরের সামনে নিয়ে এসে বর-কনের মাথার উপর একটি নতুন কাপড় দিয়ে দেওয়া হত, এই সময়েই বর-কনের মধ্যে শুভদৃষ্টী হত। তারপরে হত মালাবদল। লোকাচার হিসেবে শুভদৃষ্টীর সময় নারীরা উলুধ্বনি দিয়ে বর-কনের উপর পুস্পবৃষ্টি করতেন। রূপরাম তাঁর কাব্যে এই অংশের বর্ণনা দিয়েছেন খুব সুন্দর করে –

"মাণিক বসন পাটে বৈসে রঞ্জাবতী।
চারদিকে দিল চারি রতনের বাতি।।
সমুখে রঞ্জার পাট ধরে কোনজন।

বরকন্যা অরন্ধতী, দেখিল তখন।।
যুবতী লজ্জিত দেখি পতিরে প্রাচীন।
পাটে বৈসে পরম কৌতুকে প্রদক্ষিণ।।
অন্তস্পষ্ট ঘুচাইল সমুখে সদয়।
বদল করিতে মালা কোন নারী কয়।।
বদল করিল মালা দুজনে ছামনি।
চারি চক্ষে চাওয়াই পরে জয়ধ্বনি।।"[২৭]

সাতপাকের পর পুরোহিত একটি ঘটের উপর বরের হাতের উপর কনের হাত রেখে নতুন গামছা দিয়ে তা ঢেকে রেখে বেদ মন্ত্র পড়ে বিবাহকার্য সম্পন্ন করতেন। রাঢ়বঙ্গে বিবাহকালীন লোকাচারের মধ্যে আমরা কন্যা সম্প্রদানের মতো লোকাচার রীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। কন্যার পিতা বরের হাতে নানা দ্রব্যাদি তুলে দিয়ে কন্যা সম্প্রদান করতেন। রূপরাম তাঁর কাব্যে কন্যা সম্প্রদানের বিবরণ দিয়ে বলেছেন –

"শুভক্ষণে বেনুরাজা করে কনাদান।
সমুখে রাখিল বরকন্যা পরিমাণ।।
বরকন্যা ঘটের উপর রাখে হাত।
ব্রাহ্মণ সকল বেদ পড়ে অচিরাত।।
কুশ বান্ধে দুই হাতে তায় ফল দিয়া।
কন্যা দান বাক্য বলে তিল কুশ লয়্যা।।
তুলসী গুবাক হরীতকী ডানি করে।
সুবর্ণ সহিত কন্যা বাম করে ধরে।।
হাতে হাতে কন্যাদান করে বেনুরায়।
কৃষ্ণের পিঁড়িতে কন্যা দান দিল তায়।।"[২৮]

কনের পিতার কন্যাদান করার পর বিবাহের সর্বশেষ লোকাচার সিঁদুর দান অনুষ্ঠান পালিত হত। বর কনের মাথায় সিঁদুর পরিয়ে দিতেন এবং বরের সিঁদুর দানের পর এয়োস্ত্রীরা কনের কপালে সিঁদুর পড়িয়ে দিতেন। বিবাহ কার্য সম্পন্ন হলে বর-কনে সকলের আশীর্বাদ নিয়ে বাসর ঘরে প্রবেশ করতেন।

বিবাহের লোকাচার বর্ণনার পাশাপাশি রূপরামের কাব্যে দেখা যায় এয়োস্ত্রীদের বরকে বশীকরণের প্রয়াস। এ থেকেই তৎকালীন সময়ের বিবাহের লোকবিশ্বাসের পরিচয়টি ফুটে ওঠে। মধ্যযুগীয় সমাজে মানুষের জীবনে বিপদে আপদে বা যেখানেই অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে সেখানে কুসংস্কার ও মন্ত্রতন্ত্র কাজ করেছে। মধ্যযুগে

পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের নিরাপত্তা পাওয়া বা নারীর প্রাপ্য মর্যাদা পাওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিন্ত ছিল না। এ ব্যাপারে কনের পিতা-মাতার দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না, আর এই দুশ্চিন্তা থেকেই জন্ম নেয় লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের। বিবাহের আসরে বরকে বশীকরণের চেষ্টা এমনই একটি লোকবিশ্বাস –

"আপনি মন্দরা সাজে বরণের ডালা।
ঔষধ করিতে চাহে ছামনির বেলা।।
হাত-পেড়ি আন্যা দিল মন্দরার চেড়ী।
গণ্যা গণ্যা বারি করি ঔষধের বরি।।
লইল অশ্বত্থপাথ বিশাশয় ঠুলি।
কাচনির শিকড়ে ঔষধগুলি।।
চালু গুড় মিশ্যায়্যা তুলিয়া রাখে ভালে।
অধর জুখিতে চায় বরণের কালে।।"[২৯]

মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্য ধারায় রূপরাম চক্রবর্তী তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্যে তৎকালীন রাঢ়বঙ্গীয় সমাজের বিবাহের লোকাচার বা লোকবিশ্বাসের যে বর্ণনা দিয়েছেন পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায়, তা মধ্যযুগের অন্য কোন কবির রচনায় এত বিস্তৃত পরিসরে পাওয়া খুবই দুস্কর। সুতরাং ধর্মমঙ্গল কাব্যে রূপরাম চক্রবর্তী রাঢ়বঙ্গের সমাজ-সংস্কৃতির বর্ণনায় বৈবাহিক লোকবিশ্বাসের যে বিবরণ দিয়েছেন তা সত্যিই অনবদ্য রূপে ধরা দিয়েছে।

ধর্মমঙ্গল কাব্যে আমরা রাঢ়বঙ্গের সমাজ-সংস্কৃতির পরিচয় অনুসন্ধানে বিভিন্ন লোকাচার, আচার-সংস্কৃতির পরিচয় পেয়েছি। সমাজ-সংস্কৃতির ধারায় মৃত্যুকালীন লোকাচার একটি বিশিষ্ট লোকাচার। ধর্মমঙ্গল কাব্যে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রকাশের কথা বর্ণিত হয়েছে। তিনি এমন কোন কাজ নেই যা করতে পারেন না, তিনি সমস্ত রকম অসাধ্য সাধন করতে পারেন। তাঁর কৃপায় বা অসাধ্য সাধনের ফলে মৃত লোকও বেঁচে ওঠেন, তিনি নিঃসন্তানকে সন্তান লাভের বর দেন, বন্ধ্যা নারীর কোল আলো করেন, তিনি কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করে তুলেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যে সাধারণ ভাবে মৃত্যুর কোন ঘটনা নেই। কিন্তু ধর্মমঙ্গল কাব্যে আমরা মৃত্যুকালীন ঘটনার পরিচয় পাই। রূপরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে দেখা যায় ঢেকুর গড়ের রাজা ইছাই ঘোষ কর্ণসেনের ছয়পুত্রকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বন্দী করে এনে দেবী ভবানীর কাছে নরবলী দেন। তবে এক্ষেত্রে এই মৃত্যু স্বাভাবিক নয়, অস্বাভাবিক। রূপরামের কাব্যে এই বর্ণনা পাওয়া যায় –

"সুগন্ধি চন্দন দিল গলে ওড়মালা।
নরবলি দিতে আনে অনেক দেহালা।।

পুনরপি ইছাই ঈশ্বরী পূজা করে।
ছয় ভাই কাটা গেল দেবীর আতরে।।"[৩০]

এছাড়াও রূপরামের কাব্যে আমরা অস্বাভাবিক মৃত্যুর পরিচয় পাই জামতি পালায়, যেখানে দেখা যায়, শিবা বারুইয়ের স্ত্রী নয়ানী লাউসেনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁকে কাছে পাওয়ার বাসনা প্রকাশ করে নিরাশ হন এবং নিরাশ হয়ে সে নিজের শিশু সন্তানকে হত্যা করে –

"পাসবির পুত্র শোক দেখিলে এহারে।
কোলের বালক পথে কাছাড়িয়া মারে।।
ঘাড় মুচরিয়া শিশু মেলিল কুয়ায়।
পরিত্রাই ডাক মারি চারিপানে চায়।।"[৩১]

রূপরামের কাব্যে বর্ণিত মৃত্যুর ঘটনা দুটি অস্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে রূপরামের কাব্যে স্বাভাবিক মৃত্যুর কোন প্রকার ঘটনা নেই বলে এক্ষেত্রে মৃত্যুকালীন রীতিনীতির কোন পরিচয় ঘটেনি। তবে রূপরামের কাব্যে সমাজ প্রচলিত অনুমৃতা হওয়ার কথা আছে। রূপরাম পূর্ববর্তী অন্যান্য মঙ্গল কাব্যের কবিরা এই প্রথার উল্লেখ করেছেন, এ থেকে মনে হয় সমাজে এই প্রথার প্রচলন ছিল। তবে সপ্তদশ শতাব্দিতে এই প্রথার ব্যাপক প্রচলন বা কড়াকড়ি ছিল না। রূপরাম তাঁর কাব্যে এই ঘটনার উল্লেখ করেছেন শুধুমাত্র –

"ছয় পুত্র মৈল মোর রণে ধনুর্ধর।
ছয়বধূ অনুমৃতা শূন্য হৈল ঘর।।"[৩২]

রূপরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে মধ্যযুগের জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ ইত্যাদি সমাজ ঐতিহ্যবাহী লোকবিশ্বাস মূলক সমাজ-সংস্কৃতির ঘটনাবস্তু ছাড়াও মধ্যযুগের মানব সমাজের সামাজিক জীবনে নানা প্রথা ও বিশ্বাসের প্রচলন ছিল, যা সমাজ মানুষের নিত্যকর্মের মধ্যে পড়ত। স্নানকার্য, পুজার্চনা, অথিতিসেবা, দানকর্ম ইত্যাদি নিত্যকর্মগুলি রাঢ়বঙ্গের মানুষেরা পালন করতেন। তৎকালীন সমাজের মানুষেরা স্নান করত নদী বা পুকুরে। স্নান করার সময়ের চিত্র রূপরাম বর্ণনা করেছেন –

"তাণ্ডব করিতে নটী নিল পান ফুল।
স্নান করিবারে গেল নর্মদার কুল।।"[৩৩]

নদী বা পুকুরে স্নান করার সময় তেল মাখার রীতির প্রচলন ছিল রাঢ়বঙ্গে। স্নান করার পর বাড়িতে এসে পূজা করার রীতি ছিল। আমরা জানি কোন শুভকাজ করতে যাওয়ার আগে বা নিত্যপূজা করতে যাওয়ার আগে স্নান করা হত। রূপরামের কাব্যেও আমরা সেই রীতির পরিচয় পাই। রঞ্জাবতীর শালেভর দিতে যাওয়ার আগে স্নান করে দেবী চণ্ডীর কাছে পূজা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে –

"স্নান কর চম্পক সম্মুখে চণ্ডমূখী।
যার পূজা সাধিলে শঙ্কর বড় সুখী।।"[৩৪]

শুধুমাত্র তাই নয়, নিত্য পূজার্চনার সময়েও অষ্টাঙ্গ তিনবার জল দিয়ে শুদ্ধ করে নিত হত –

"অর্চনা করিল আগে হাতে জল দিয়া।
অঙ্গুরি বসন মাল্য চন্দন লইয়া।।"[৩৫]

ধর্মমঙ্গল কাব্যে পশু ও নরবলি উভয় রকম বলিদানের প্রথা প্রচলিত ছিল। বলিদান প্রথা প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষ তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি' (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থে বলেছেন – "নরবলি বা উৎসর্গ-প্রথা (human sacrifice) একটি সুপ্রাচীন প্রথা। নিষাদ ও কিরাত (Indo-Mangoloid) জাতির সংস্কৃতিতে এই প্রথার গভীর তাৎপর্য ছিল। বিজয়োৎসব ও নানা রকমের কামনা-উৎসবের অঙ্গ ছিল নরবলি ও নরমুণ্ডনৃত্য (শবর, নাগা প্রভৃতি জাতির মধ্যে কিছুদিন আগেও প্রচলিত ছিল)। আর্যদের মধ্যে পুরোহিত ব্রাহ্মণশ্রেণী এই প্রথা 'অধর্ম' বলে নিন্দা করলেও ক্ষত্রিয় রাজারা দীর্ঘকাল এই প্রথা পালন করেছে। বৈদিক সাহিত্যে ও মহাভারতে তার অনেক উপাখ্যান-উদাহরণ আছে। ক্রমে এই প্রথা আর্যীকৃত হয়েছে এবং বিভিন্ন মিশ্র-সংস্কৃতিতে বিন্যস্ত হয়ে তার তাৎপর্যও বদলে গেছে।"[৩৬] রুপরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে সামাজিক লোকাচারের মধ্যে বলি দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। মনে হয় রাঢ়বঙ্গে পুজার্চনায় বলি দেওয়ার রীতি বেশ জাঁকজমক ভাবে হত। রূপরাম তাঁর কাব্যে লিখেছেন –

"কাটিল যুগল মেষ অনেক ছাগল।
রুধিরে ধরণী হৈল সাক্ষাৎ কমল।।"[৩৭]

অথিতি দেবভব, অতিথিকে আমরা নারায়ণের (বিষ্ণু) সঙ্গে তুলনা করি। আর বাঙালি জাতি অথিতি পরায়ন ও অথিতি বৎসল। রূপরাম চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল কাব্যে হরিশ্চন্দ্র পালায় দেখা যায় ধর্মঠাকুর সন্যাসী বেশে রাজা হরিশ্চন্দ্রর বাড়িতে আসলে রাজা হরিশ্চন্দ্র সম্মান জানিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করেছেন –

"হরিশ্চন্দ্র তখন ধাইল উভরড়ে।
পতিতপাবন দেখ্যা পায় গিয়া পড়ে।।"[৩৮]

অথিতিকে আপ্যায়ন করে নিয়ে গিয়ে অথিতির ইচ্ছায় নিজের ছেলেকে হত্যা করে আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছেন। দানকর্মকে সমাজের নিত্যকর্ম বলে মনে করা হত। সন্তান জন্মানোর পর বা কোন অনুষ্ঠান হলে সম্পন্ন মানুষেরা প্রচুর দান ধ্যান করতেন।

রূপরামের কাব্যে দেখা যায় লাউসেনের জন্মের পর রাজা কর্ণসেন হীরা দাইকে প্রচুর ধন দান করেছেন –

"বুড়া রাজা মনে করে আমি ভাগ্যবান।
পুত্রমুখ দেখিয়া অনেক দিল দান।।"[৩৯]

এছাড়া রাঢ়বঙ্গে দেখা যায় কোন কাজের সাফল্যের স্বীকৃতি দিতে পান দিয়ে সম্মান জানানো হত। গৌড়েশ্বর মহামদকে পান দিয়ে সম্মান জানিয়েছেন ইছাই ঘোষের কাছ থেকে বেশি করে কর আদায় করার জন্য –

"রাজকর দিলে তার বাড়াব সম্মান।
বক্শিস করিব তাকে দশ বিড়া পান।।"[৪০]

লোকাচারের পাশাপাশি রাঢ়বঙ্গে বিভিন্ন লোকবিশ্বাসের পরিচয় আমরা পেয়েছি। সপ্তদশ শতাব্দীর বিভিন্ন লোকবিশ্বাসের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন রূপরাম তাঁর কাব্যে। সেকালে যাত্রাকালে বা কোন শুভ কাজ করার আগে আঁটকুড়া বা বন্ধ্যা নারীর দর্শন করা পাপকর্ম বলে মনে করতেন সমাজের লোকেরা। রূপরাম তাঁর কাব্যে লিখেছেন –

"পাত্র বলে ওহে রাজা না কহিলে নয়।
আঁটকুড়া দরশনে মহাপাপ হয়।।
অপুত্রক জনের দেখিতে নাই মুখ।
বদন দেখিলে পাই তার কত দুখ।।"[৪১]

তবে যাত্রাকালে অসতী নারীর সঙ্গে দেখা হলে তাকে শুভ বলে মনে করা হত, কিন্তু সেই অসতী নারীকে স্পর্শ করা পাপ কাজ বলে হয়, সেই কথার পরিচয় রয়েছে জামতী পালায় –

"অসতী লোকের সঙ্গে করিলে আলাপ।
একাসনে বসিলে বিস্তর বাড়ে পাপ।।"[৪২]

বাঙালি জাতি চিরকালই কুসংস্কারাচ্ছন্ন, যাদুবিদ্যা, মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাসী। আজকের দিনেও আমরা পাঁজি পুথির নিয়মের বেড়াজাল থেকে বাইরে বেড়তে পারিনি, মধ্যযুগে তো আরও না। আমরা রূপরামের কাব্যে জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রয়োগ লক্ষ্য করি। জ্যোতিষ লাউসেনের কাছে নিজেকে জাহির করতে চেয়েছেন –

"গণ্যা দিতে পারি তারা গগণ মণ্ডল।
কুম্ভে মাপ্যা দিতে পারি সমূদ্রের জল।।"[৪৩]

ধর্মমঙ্গল কাব্যে দেখা যায় লাউসেনকে সাপে কামড়ালে ওঝার জায়গা নিয়েছে কর্পূর, কর্পূর লাউসেনের হাতে তাগা বেঁধেছে এবং সর্পবিষনাশের মন্ত্র পড়া শুরু করে বিষ নামানোর চেষ্টা করেছে ওঝার মত করে,

"শীঘ্রগতি লাউসেনে কর্পূর কোলে নিল।
লল্লাট নিঃসরে তাগা বান্ধিতে লাগিল।।
তাগা বান্ধি কপালে আপনি বিষ ঝাড়ে।
ঘুমে সকাতর বীর অঙ্গ নাই নাড়ে।।
মন্ত্র পড়ি ডাক্যা বলে কর্পূর পাতর।
যেখানে উড়িল বিষ সেইখানে মর।।
লল্লাট নিকটে ঝাড়ে ঘনে ঘন।
নিদ্রা ভাঙ্গি লাউসেন উঠিল তখন।।"[৪৪]

মধ্যযুগে রাঢ়বঙ্গীয় সমাজে লোকবিশ্বাস ছিল, মন্ত্র পড়ে মানুষকে ঘুম পাড়ানো হত। আমরা ছোটবেলায় ঘুম পাড়ানি মাসি-পিসির গান শুনেছি, তবে তা অন্য প্রসঙ্গে। কিন্তু রূপরামের কাব্যে লাউসেন চুরি পালায় ইন্দেমেটে লাউসেনকে চুরি করতে এসে নিদ্রালি মন্ত্র পড়ে ময়নার সকল মানুষকে ঘুম পাড়িয়েছে, শুধু তাই নয় তাঁর মন্ত্রে জীবজগৎ পক্ষীকূল সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে। রূপরামের কাব্যে এই অংশের বর্ণনা খুব মনোজ্ঞ হয়ে উঠেছে পাঠকের কাছে –

"ঘরের বিড়াল ঘুমে নাছের কুকুর।
ফুলবনে গড়াগড়ি ভুজঙ্গ মউর।।
ধর‍্যাছিল মণ্ডুক গণ্ডুষ নাই কড়ে।
খায়্যাছিল আহার রাখিল কার তরে।।
তাঁত বোনে তাঁতি ভাই ঘন মাথা নাড়ে।
চক্ষে বাজে নিন্দাটি পড়িল তাঁতগাড়ে।।
সিন্দাল চোর সিঁদ কাটে গৃহস্থের বাড়ী।
নিন্দাটি পাইয়া তারা যায় গড়াগড়ি।।
কাক পক্ষ কোকিল ঘুমায় বস্যা ডালে।
মকর কুম্ভীর মীন নিদ্রাগত জলে।।"[৪৫]

মধ্যযুগীয় মঙ্গলকাব্যে জনজীবনের আঁধার খুব কম পরিসরেই পাওয়া যায়, তদুপরি বীররসাত্মক মঙ্গলকাব্য তথা রাঢ়বঙ্গে রচিত রূপরামের ধর্মমঙ্গল কাব্য বীরত্ব ও যুদ্ধ বিগ্রহের ঘটনা পূর্ণ হওয়ায় সেখানে জীবনচর্চার ছবি অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের তুলনায় খুবই

স্বল্প। তবে রূপরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে জনজীবনের চিত্র যতটুকু ধরা পরেছে তা উপেক্ষার অধীন। সপ্তদশ শতকে আবির্ভূত রূপরামের কাব্যে জনজীবনের যে ছবি ধরা পরেছে তা বাংলাদেশের সমাজ ইতিহাসের উপাদান হিসাবে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রূপরাম ব্যতীত অন্যান্য কবিদের কাব্যে সপ্তদশ শতকের জনজীবনের অঙ্কিত চিত্রের পরিসর আরো ক্ষীণ। সপ্তদশ শতকে রাঢ়বঙ্গের নানা চিত্র কৃষিকাজ, খাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছেদ, সাজসজ্জা ও অলঙ্কারের ব্যবহার, ধর্মচর্চা, বিনোদন, যাতায়াত ব্যবস্থা, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের পারস্পরিক সম্পর্ক, নৈতিক মান, নারীদের স্থান ইত্যাদি বিষয়ের তথ্য রূপরাম তাঁর কাব্যে সুক্ষাতীসুক্ষ ভাবে উল্লেখ করেছেন; তার মধ্য থেকেই রাঢ়বঙ্গের সমাজ জীবনের ধারণা লাভ করা যায়।

রূপরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে কৃষিজীবি মানুষের পরিচয় পাই। রাঢ়বঙ্গ ছিল প্রকৃতি নির্ভর। প্রকৃতি নির্ভর হওয়ায় ভালো বৃষ্টি পাত হলে রাঢ়বঙ্গে শস্যের অভাব হত না। মানুষ তখন স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করত। এই অংশের পরিচয় রূপরাম তাঁর কাব্যের আদ্যঢেকুর পালায় দিয়েছেন। রমতি নগরে বন্দী সোমঘোষোকে বন্দী অবস্থায় দেখে পাত্র মহামদের কাছে তার কারণ জানতে গিয়ে গৌড়েশ্বর বলেন –

"অবধানে শুন পাত্র আমার বচন।
সোমঘোষ বন্দী কেন গৌউড় ভুবন।।
বার মাসে তের বার ঘুর্ণি মেঘে জল।
তবে কেন প্রজা বন্দী তার কথা বল।।"[৪৬]

রাঢ়বঙ্গে বৃষ্টিপাত সেভাবে না হলে ফসল হত না , তাই প্রজারা কর দিতে না পারলে তাদের বন্দী করা হত। তৎকালীন সময়ে রাঢ়বঙ্গের ভূমিসত্ত্ব ছিল বড়ো জমিদারের অধীন। তাঁরা তাদের অধীনে থাকা জমদারদের করের বিনিময়ে তাদের ভূমিসত্ত্ব প্রদান করতেন। ভূমিসত্ত্ব ভোগীরা জমিদারের খাজনা মেটাতেন কড়ি ও নানান দ্রব্যাদির মাধ্যমে। আর কর না দিতে পারলেই তাদের বন্দী করা হত। রূপরামের কাব্যে দেখা জায় –

"নফর চাকর নিল মনে আনন্দিত।
চলিল রাজার সঙ্গে সকলে তুরিত।।
গৌউড় শহরে যাত্যে বাড়াইল পা।
দোলার উপরে যেন হেলাইল গা।।
গৌউড় শহরে রাজা করিল গমন।
আগু পাছু নফর চলিল শতজন।।"
বই হৈল ময়না পারাল্য কাল্যাঘাই।

পদুমার বিলে পড়ে টমকে তেঘাই।।
হাত সন বৎসর বেবাক নিল কড়ি।
নানা ধনে ভার বোঝা বহে উট-গাড়ি।।"[৪৭]

রাঢ়ের ভূমিসত্ত্ব ভোগীরা ছিলেন জমিদারের অধীন, তাদের ভূমিসত্ত্ব নির্ভর করত জমিদারের উপর। রূপরামের কাব্যে দেখা যায় গৌড়েশ্বর সোমঘোষের কাছ থেকে ভূমিসত্ত্ব কেড়ে নিয়ে কর্ণসেনের উপর ভূমিসত্ত্বের অধিকার দেন –

"রাজা বলে শুন ঘোষ অবধান কর।
সানকি করিতে চল ঢেকুর ভিতর।।
যার নাম ঢেকুর ত্রিষষ্ট তারে কয়।
কর্ণসেন রাজা তায়তি সুখময়।।
তাহার উপরে গিয়া কর ঠাকুরাল।
সমে মাত্র গৌউড়ে পাঠাবে ইসরাল।।"[৪৮]

সপ্তদশ শতকে রাঢ়বঙ্গের মানুষের প্রধান অর্থনৈতিক সহায়ক ছিল কৃষিকাজ। ধান ছিল কৃষী দ্রব্যের মধ্যে প্রধান। উড়ি, মিনি ধানের নাম পাওয়া যায় সেই সময়ে। তাছাড়া গম, আখ, তিল, মুগ, মুসুর, সরষে ইত্যাদি ফসলের চাষ করতেন রাঢ়বঙ্গের কৃষকেরা। কেসুর, পানিফল, নারকেল, কাঠাল, সুপারি, তাল, আম, জাম ও বিভিন্ন প্রকার লেবুর চাষ করা হত রাঢ়বঙ্গে, যা কৃষিকাজেরই অঙ্গ।

রাঢ়বঙ্গের মানুষের প্রধান খাদ্য ছিল ভাত, তার সাথে ছিল ডাল, শাক-সবজি, তরকারি ইত্যাদি জাতীয় খাদ্য। রূপরামের কাব্যের গোলাঘাট পালায় সুরীক্ষা বেশ্যার রন্ধন দৃশ্য থেকে তৎকালীন রাঢ়বঙ্গের রন্ধনরীতির ও খাদ্যাভাসের স্বরূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে –

"পঞ্চাশ ব্যঞ্জন রান্ধে নাই অবহেলা।
দূরদূর জ্বাল দেই জলের শিয়ালা।।
রসউল্লা ব্যঞ্জন করেন ঝোল ভাজা।
মুগডালি সান্তানিল ব্যঞ্জনের রাজা।।
বার্তাকু নিমেতে সিম করিল সুপাক।
তৈলে টলটলি করে বাথুয়ার শাক।।
রান্ধিল পুতিকা শাক দিয়া ফুলবড়ি।
চুঁয়া চুঁয়া ঘৃতে ভাজা করে পলা কড়ি।।
মানের বেসারি রান্ধে ব্যঞ্জন রসাল।
ঘটে নিঙ্গারিয়া নিল আদ্রকের ঝাল।।

দশ গোটা লইয়া ভাজিল নারিকল।
ভিন্ন ভিন্ন রান্ধিল কেসুর পানিফল।।
রন্ধন করিয়া নটী ডাবরে রাখিল।
পুরটের থালাখানি উপরে ঢাকিল।।"[৪৯]

রাঢ়বঙ্গে তখন আমিষ ও নিরামিষ দুই ধরনেরই খাবারের প্রচলন ছিল। স্বচ্ছল ব্যক্তিরা দুধ, ঘি, মাছ, ভেড়া, ছাগল, হাঁস ইত্যাদির মাংস খেত। রূপরামের ধর্মমঙ্গলে আমরা দেখতে পাই রাজা হরিশ্চন্দ্র ধর্মঠাকুরকে চাপাকলা, পিষ্টক পায়স, ক্ষীর, মোষের দুধ, শর্করা, মধু ইত্যাদি দ্রব্য দিয়ে নিবেদন করেছেন। তবে সমাজের দারিদ্র্য সীমায় বসবাস করা মানুষের প্রধান খাদ্য ছিল ভাত। সেটাও না জুটলে খেতে হত জলমিশ্রিত ভাত আমানি খেতে হত।

রাঢ়বঙ্গের লোকেরা তখন নারী-পুরুষ ভেদে বিভিন্ন ধরনের পোষাক পরতেন। রূপরামের কাব্য থেকে জানা যায় সমাজের উচ্চবিত্ত পুরুষেরা তসরের ধুতি, জামা, চাদর, উত্তরীয়, পাটের তৈরী মোটা কাপর পরতেন –

"এত যদি গৌড়েশ্বর করিল আশ্বাস।
বাঘছাল রাখিয়া পরিল পট্টবাস।।"[৫০]

রূপরামের কাব্য থেকে এও জানতে পারি সমাজের উচ্চবিত্ত বা সম্পন্ন শ্রেণির মহিলারা দামী কাপড় পরতেন। রঞ্জাবতী বিবাহের পর বাসর ঘরে রেশমের শাড়ি শুয়াঁঠুটি পরেছিলেন –

"বাছিয়া বসন পরে শুয়াঁঠুটি।
বাইশ গজ বসন বা হাতে হয় মুঠি।।"[৫১]

সপ্তদশ শতাব্দীতে দেশে ও বিদেশে তসরের কাপড়ের বিপুল চাহিদা ছিল। আর বাংলার মসলিন ছিল জগৎবিখ্যাত। রূপরাম তাঁর কাব্যে হুগলির তসরের কথা বলেছেন বারবার। উচ্চবিত্ত পুরুষদের ক্ষেত্রে মুসলমান পুরুষেরা কুর্তা, ইজার ও পাগরী পরিধান করতেন এবং সন্যাসী পুরুষেরা পরতেন বাঘছাল। তবে সমাজের দারিদ্র্য সীমায় বসবাসকারী বা নিম্নশ্রেণির মানুষেরা পরতেন পাটের তৈরী মোটা কাপড়।

রূপরামের কাব্য থেকে রাঢ়বঙ্গের নারী-পুরুষ উভয়ের প্রসাধন ও সাজসজ্জার পরিচয় পাই। রূপরামের কাব্যে দেখা যায় ইন্দ্রের সভার নটী অম্ববতী স্বর্গে নৃত্য করার সময় নানা ধরনের অলঙ্কার পরে নিজেকে সাজিয়েছেন –

"নটীর নাপান বড় রসকথা হাসি।
সমুখে লাসের পেড়া আন্যা দিল দাসী।।

বন্ধন মুকলি তার ঘুচাইল ডালা।
ঘোর অন্ধকার ছিল রূপে হৈল আলা।।
সোনার গিলিপে ছিল সাধের চিরনি।
কেশের মার্জনা বেশ করিল আপনি।।
মল্লিকা মালতী দিয়া বান্ধিল লোটন।
বাদলে ময়ূর যেন ধরিল পেখম।।
ছকুড়ি চাপার ফুল মালতীর মালা।
মেঘের উপরে যেন চাঁদ করে আলা।।
লোটোনে বান্ধিল চাঁপা শোভা করে কেশ।
অভরণ করিয়া অঙ্গের করে বেশ।।
চারিদিকে দিল তায় চন্দনের রেখা।
চাঁদের উপরে যেন চাঁদ দিল দেখা।।
ঈষত কাজল রেখা দিল তার কাছে।
নৌতন মেঘের ছলা আর কোথা আছে।।
অধর উপরে দিল যাবকের দাগ।
দ্বিগুন বাড়িল শোভা তাম্বুলের রাগ।।"[৫২]

সাজসজ্জার জন্য বিভিন্ন দ্রব্য গায়ে মাখা হত, চন্দন দিয়ে দেহ সুবাসিত করা হত এবং মালতী ফুলের মালা পরে, কাজল পরে, কপালে সিঁদুর পরে, মুখে পান দিয়ে মুখ লাল করে নিজেকে সজ্জিত করতেন। সেইসঙ্গে বিভিন্ন ধরনের গয়না পরতেন, যেমন – কানে কুণ্ডল, নাকে নাকছাবি, হাতে সোনার কঙ্কণ, বাজুবন্ধ, আঙুলে অঙ্গুরী, পায়ে নুপুর, খোঁপায় সোনার চিরুনি আঁটা থাকত তখনকার সম্পন্ন বাড়ির নারীদের। তবে নারীদের মতো এতো না হলেও রাঢ়ের পুরুষেরা কিছু কিছু গহনা পরতেন। সোনার আংটি, গলায় মুক্তোখচিত সোনার হার ও কানে সোনার দুল পরতেন। সেইসঙ্গে সম্পন্ন বাড়ির শিশুদের হাতে সোনার বালা ও পায়ে খাড়ু পরনো হত, সেই বর্ণনা করেছেন রূপরাম তাঁর কাব্যে –

"সাধ কর‍্যা সদাই সিঁদুর ফোঁটা পরে।
চরণে মগর খাড়ু অতি শোভা করে।।
তাড় বালা দুহাতে মাণিকমালা গলে।
মকর কুণ্ডল কর্ণে অলঙ্কারে জ্বলে।।"[৫৩]

রাঢ়বঙ্গের দারিদ্র্য সীমায় বসবাসকারী মহিলারা পিতলের ও গিল্টির গয়না পরে শখ মেটাতেন। অন্যদিকে বারবণিতারা শোলার গয়না পরে নিজেকে মনোরম করে তাঁরা পুরুষদের মন ভুলাতো –

"মালী সইএর ঘর যাব এই ভাবে মনে।
শোলার পরিব গিয়া অষ্ট আভরণে।।
শোলার মাদুলি লব আর নাকচনা।
লাস বেশে এখনি ভুলাব মুনিজনা।।"[৫৪]

রাঢ়বঙ্গে সেই সময় বিদ্যাচর্চারও প্রচলন ছিল তার পরিচয় জানা যায় রূপরামের কাব্য থেকে। রূপরাম তাঁর আত্মজীবনীতে জানিয়েছেন রঘুনাথ ভট্টাচার্যের টোলে 'জুমর', 'অমর' গ্রন্থের টীকা, মাঘের 'শিশুপালবধ', কালিদাসের 'রঘুবংশ' ও শ্রীহট্টের 'নৈষধচরিত', 'রামায়ণ', 'মহাভারত' ইত্যাদি গ্রন্থ তিনি পাঠ করেছেন। রূপরাম উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য নবদ্বীপ বা শান্তিপুরে যান, তার পরিচয় দিয়েছেন রূপরাম—

"পড়াতে নারিল তোরে যাহ চল্যা দূর।
নবদ্বীপ যাহ কিবা যাহ শান্তিপুর।।
বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য নবদ্বীপে আছে।
ভারতী পড়িতে বেটা চল তার কাছে।।"[৫৫]

তৎকালীন সময়ে তথা মধ্যযুগে নবদ্বীপ ছিল বাংলাদেশের বিদ্যাচর্চার পীঠস্থান। সেখানে বাংলাদেশ ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে বিদ্যালাভের জন্য আসতেন বিদ্যার্থীরা। রাঢ়বঙ্গে তখন বাড়িতে পুরোহিত ডেকে সরস্বতী পূজা করে হাতেখড়ি দেওয়া হত। রূপরামের কাব্যে আমরা লাউসেন ও কর্পূরের হাতেখড়ি অনুষ্ঠানের পরিচয় পেয়েছি –

"যুগল বৎসরে হাতে খড়ি দিতে নাঞি।
ডাকায়্যা আনিল তবে পণ্ডিত গোসাঞি।।
দুই ভাই স্নান করে তোলা গঙ্গাজলে।
সরস্বতী পূজিল আনন্দ কুতূহলে।।
পরিপাটি নানা দ্রব্য আনিল তখন।
সমুখে রাখিল যথা কুলের ব্রাহ্মজ।।
জয় দিল কল্যাণী মাণিকী দুই চেড়ী।
শুভক্ষণে লাউসেনের হাতে দিল খড়ি।।"[৫৬]

হাতেখড়ি দেওয়ার পর গুরুর তত্ত্বাবধানে গুরুগৃহে বিদ্যাচর্চা শুরু হত। অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন হলে অষ্টফলা, অষ্টধাতু, অষ্টপদ মুখস্থ করাতেন। জ্ঞানচর্চা শেষ হলে ব্যাকরণ পাঠ,

অমরসিংহ, ভট্টিকাব্য, রঘুবংশ, অলংকার শাস্ত্র, জ্যোতিষবিদ্যা, সংস্কৃত নাটক, অষ্টাদশ পুরাণ সহ একে একে চৌষট্টি বিদ্যায় পারঙ্গম হয়ে উঠত সকল বিদ্যার্থীরা। পড়াশোনার পাশাপাশি পুরুষেরা শরীরচর্চাতেও মনোনিবেশ করতেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যে আমরা দেখি লাউসেনকে মল্লবিদ্যায় পারদর্শী করার জন্য কর্ণসেন-রঞ্জাবতী সারেঙ্গধল মল্লকে নিযুক্ত করেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যে পুরুষদের বিদ্যাচর্চা ও শরীরচর্চা করতে দেখা গেলেও নারীদের বিদ্যাচর্চার কোন পরিচয় নেই রাঢ়বঙ্গে। তবে নারীরা যে পড়াশোনা জানতেন তার পরিচয় পাওয়া যায় জাগড়ণ পালায় কানাড়ার লাউসেনকে পত্র লেখার মধ্য দিয়ে –

"কানাড়া লিখেন পত্র দ্বিপ্রহর রাতি।
ধুমসী নিকটে ধরে কনকের বাতি।।
হেঁটমুখে সুন্দরী স্বামীকে পত্র লিখে।
মনে দুঃখ বারতা চিনতেন একে একে।।"[৫৭]

রূপরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে আমরা যৌথ পরিবার ভিত্তিক সমাজের পরিচয় পাই, তা রূপরামের আত্মপরিচয় থেকে জানতে পারি –

"অনেক দিবস বাড়ী কাইতি শ্রীরামপুর।
চারি ভাই ঘর করি বিধাতা নিষ্ঠুর।।"[৫৮]

পুরুষেরা বাইরের কাজ করতেন এবং নারীরা গৃহস্থালির কাজ করতেন এবং অবসর সময় কাটাতেন সকলে একসঙ্গে গল্প করে। তাছাড়া রাঢ়বঙ্গের পুরুষেরা অবসর সময়ে শিকার করা ও মাছ ধরতে যেতেন। রূপরামের কাব্যে আমরা মৎস্য ধরার পরিচয় পাই –

"ঈষত মৎসের টোপ করিল গাঁথন।
টোপ গাঁথ্যা পেলে কালু ডোমের নন্দন।।
বড় বড় মাছ তোলে কাতল চিতল।
হেন বেলা ঢেকুর করিছে টলবল।।"[৫৯]

অন্যদিকে নারীরা গৃহস্থালীর কাজ করে নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করতেন বা সম্পন্ন বাড়ির মহিলারা পুরুষদের সাথে বসে তাস খেলতেন। রঞ্জাবতী ও কর্ণসেন অবসর সময়ে পাশা খেলে কাটিয়েছেন –

"রঞ্জার সহিত পাশা খেলে নিরবধি।
মুখে মুখে পান করে কত সুধানিধি।।"[৬০]

এছাড়াও রাঢ়বঙ্গের শিশু ও বালকেরা খেলাধুলা করে সময় কাটাত। তখন ইড়িক, চোপাড় ইত্যাদি খেলার প্রচলন ছিল।

সপ্তদশ শতকে বানিজ্য প্রথা চলত বিনিময় প্রথার মাধ্যমে। সেই সময় বৈদেশিক বাণিজ্য বন্ধ হয়ে গেলে শুধুমাত্র দেশীয় বাণিজ্য চলত। রাঢ়বঙ্গের ডোম জাতিরা বাঁশ, বেত, শালপাতা ইত্যাদি দিয়ে নানারকমের গৃহস্থালীর সামগ্রী নির্মাণ করতেন। রূপরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে দেখা যায় –

"কুলা চেটা ধুনচি ডুমনি বসি বান্ধে।
শাখা সুখা দুতি পত্র অন্ন হেতু কান্দে।।
মউরা মলিন মুখী বোনে তাল-পাত।
হাতে নিঞা বেচিলে বৈকালে জোড়ে ভাত।।"[৬১]

এছাড়াও রূপরামের কাব্যে তেঁতুল পাতা দিয়ে লাউসেনের জন্য থালা, বাটি ও খুড়ি নির্মাণের পরিচয়ও রয়েছে কাব্যে –

"তেঁতলির পত্র পাড়ি নিলেন ভবানী।
লাউসেনের কাছে থাল গড়েন আপনি।।
দেবতা অসুর নর জানে বিষ্ণুজাল।
সুরীক্ষার সংহতি ঈশ্বরী গড়ে থাল।।
তেঁতলির থালা গড়ে তেঁতলির ঝারি।
উপলক্ষ নটী তথি গড়েন ঈশ্বরী।।
খুরি বাটি থালা হল্য পরম সুন্দর।
লাউসেন বস্যা দেখে কর্পূর পাতর।।"[৬২]

রূপরাম তৎকালীন সময়ের রাঢ়বঙ্গের হস্তশিল্পের চিত্র তুলে ধরেছেন কাব্যে। মঙ্গলকাব্যের একটি গতানুগতিক চিত্র হল কাঁচুলি নির্মাণ, তবে কাঁচুলি নির্মাণ গতানুগতিক হলেও রূপরাম কাঁচুলির উপর বিভিন্ন দেবদেবীর, পাখির চিত্র একেছেন, যা থেকে বাঙালির সুচিশিল্পের পরিচয় উঠে আসে। রূপরাম তাঁর কাব্যে বিভিন্ন ধরনের বাড়ি নির্মাণের কথা বলেছেন, যেমন – চৌচালা, বাঙ্গালা, জলটুঙ্গি ইত্যাদি। শুধুমাত্র বাড়ি নির্মাণই নয়, গৃহস্থেরা নিজেদের ঘর-বাড়ি সাজাতেন মনোরম বা রুচিশীল করে –

"পবিত্র করিল ঝারি বিচক্ষণ পাটি।
ময়ূর পালক ঝাটা ঘরে দিল ঝাটি।।
পাতিল শীতল পাটি তায় সাবধান।
তায় পুন রাখিল অপূর্ব খাটখান।।"[৬৩]

তবে রাঢ়বঙ্গের দারিদ্র্য লোকেরা বা নিম্নবিত্ত শ্রেণির লোকেরা মাটির দেওয়াল নির্মিত ঘরে করে তার মধ্যে বসবাস করতেন।

রূপরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে বিভিন্ন প্রকার যানবাহনের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে সাধারণ মানুষেরা যাতায়াত করতেন পদব্রজে এবং সম্পন্ন মানুষেরা দোলায় চেপে যেতেন। রূপরামের কাব্যে কর্ণসেন যখন পাত্র মিত্র নিয়ে গৌড় যাত্রা করেন তখন তিনি দোলায় চেপে গিয়েছেন –

"গৌউড় শহরে যাত্যে বাড়াইল পা।
দোলার উপরে যেন হেলাইল গা।।
গৌউড় শহরে রাজা করিল গমন।
আগু পাছু নফর চলিল শত জন।।"[৬৪]

তবে যুদ্ধের সময় অশ্ব ও হাতির ব্যবহার ছিল। সৈন্যরা তাদের পিঠে চেপে যুদ্ধ করত। যুদ্ধের সময় অশ্ব ও হাতিকে সুসজ্জিত করা হত –

"সাজল করিল ঘোড়া অণ্ডির পাথর।
পুরটের জিন দিল পৃষ্ঠের উপর।।
আশে পাশে উরমাল ঘাঘর ঘন্টা বাজে।
কপালে কণক সীথি মনুহর সাজে।।
গলায় গজকা বান্ধ কলধৌত কানি।
পাটের থোপনা দিয়া বিনাইল বেণী।।
বার খণ্ড রিকিব রাখিল বশে বশে।
পরশ পাথর মণি ইন্দ্রনীল ভাসে।।"[৬৫]

তখনকার দিনে ঢাল, খাঁড়া, ফলা, বর্ষা, বল্লম, তীর ধনুক, বাঁটুল লাঠি, বন্দুক, কামান ইত্যাদি অস্ত্রের ব্যবহার করা হত যুদ্ধে। সৈন্য দলে আগরি, গোয়ালা, পাটন, ডোম, বাগদী, লোহার এবং চোয়াড় ইত্যাদি জাতির লোকেরা প্রতিনিধিত্ব করত।

রাঢ়বঙ্গের লোকেরা বিভিন্ন ব্রতকথা, পুজার্চনা করতেন, তবে দেবী ভবানী ও ধর্মের পূজার প্রচলন ছিল বেশি। লাউসেন ধর্মঠাকুরের পূজা করতেন এবং ইছাই ঘোষ দেবী ভবানীর পূজা করতেন। ইছাই যেভাবে দেবী ভবানীর পূজা করতেন রূপরাম তার বর্ণনা দিয়েছেন –

"ঢাক ঢোল শিঙ্গা কাড়া মন্দিরা মাদল।
নানা পুস্প পারিজাত পূজা নিরমল।।
ছাগ মেষ মইষ বলি দিলেক ইছাই।
চৌষোট্টি যোহিনী দানা উরিল তথাই।।
শঙ্খ পড়া বীণা বাঁশি জয়ঘণ্টা বাজে।

ক্ষীর পিঠা মধু দিয়া ভগবতী পূজে।।"[৬৬]

তেমনি জাগরণ পালায় লাউসেনের পশ্চিমে সূর্যোদয়ের সময় ধর্মঠাকুরে পূজা করেছেন যেভাবে তার বর্ণনাও খুবই মনোজ্ঞ হয়ে উঠেছে –

"এতো শুনি লাউসেন পূজায় দিল মন।
জয়ধ্বনি শঙ্খধ্বনি হাকণ্ড ভুবন।।
ধূপধুনা পরিপাটি ঘোর অন্ধকার।
পূজা করে লাউসেন ঠাকুর অবতার।।
ভারত ভূমেতে যবে এক দণ্ড রাতি।
গাএ বসাইল যেন হীরাধর কাতি।।
মহামাংস কাট্যা দেহ দণ্ডের উপর।
যূথী পুস্প হয়্যা পড়ে ধর্মের নিয়ড়।।
সব মাংস কাট্যা দিল অস্থি হৈল সার।
গলে কাতি দিল তবে রাজার কুমার।।
গলে কালদণ্ড দিয়া বলে রাম রাম।
আপনার মাথা কাট্যা দিল বলিদান।।"[৬৭]

অনুমিত হয় পূজা করার সময় বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র সহযোগে নৃত্য করা হত এবং পুজায় বিভিন্ন পশু বলি দেওয়া হত। রূপরামের কাব্যে আমরা দেখি ধর্মের পুজায় ধর্মের ভক্তরা কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করতেন ও নিজেকে দৈহিক ভাবে নির্যাতন করতেন, সেই ঘটনাও আমরা দেখতে পাই।

রূপরামের ধর্মমঙ্গল কাব্য থেকে জানা যায়, রাঢ়ে বিভিন্ন পেশা ভিত্তিক মানুষের বসবাস ছিল। সকলেই কোন না কোন পেশার সাথে যুক্ত, কেউ কর্মহীন হয়ে ঘরে বসে থাকত না। সমাজ তা ঘৃনার চোখে দেখত –

"ঘরে বস্যা থাকিলে সম্পদ সুখ নাই।
দরবারে বসিলে বাড়ে বিশেষ বড়াই।।"[৬৮]

রূপরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে সেই সময়ের সমাজের বিভিন্ন মানুষ পারস্পারিক সৌহার্দ্যের মধ্যে বসবাস করতেন। রূপরাম রমতি নগরের বর্ণনায় তার বিবরণ দিয়েছেন –

"নিবাস করিতে দিল দিব্য বাড়ি ঘর।
অধিকার দিল নিশি রাখিতে নগর।।
ইনাম পাইয়া তবে বৈসে সর্বজন।
বসিল ব্রাহ্মণ আদি ছত্তিশ বরণ।।"[৬৯]

রূপরামের ধর্মমঙ্গল কাব্যে পুরুষের বহুবিবাহের পরিচয় পাওয়া গেলেও নারীদের একাধিক বিবাহের কথা পাওয়া না। রাঢ়বঙ্গে সেই সময় সমাজে বারবণিতাদেরও কথা পাওয়া যায়, তা সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক ছিল। তবে পতিতা নারীদের সাথে সাথে আমরা রাঢ়বঙ্গে সতী নারীদেরও পরিচয় পেয়েছি। রঞ্জাবতী, কানাড়া, কলিঙ্গা, লখ্যা ডোমনি – নারী চরিত্রগুলি তাদের সতীত্বে ও কর্তব্যে অবিচল থেকেছে সর্বদা।

রূপরামের কাব্যে আমরা সমাজ-সংস্কৃতি ও জনজীবনের যে পরিচয় পেয়েছি আজকের দিনের নিরিখে তার সত্যতা যাচাই করা যায় না। রূপরামের কাব্যে রাঢ়বঙ্গীয় সমাজের লোকাচার ও লোকবিশ্বাসের যে পরিচয় কবি দিয়েছেন তা আমাদের পাঠক সমাজ বেশ তৃপ্তির সাথে তার স্বরূপ আস্বাদন করেছেন। রূপরামের সমাজের মানুষেরা আচার-সংস্কার পালনে তারা পরিতৃপ্ত হতেন। সমাজের অসহায়, বঞ্চিত, বিপর্যস্ত, নিরুপায়, অজ্ঞ মানুষের অবলম্বন ও শক্তি ছিল এই বিশ্বাস-সংস্কারগুলি। কোন যুক্তি তর্ক নয় বা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির বিচারে নয়, এই সব লোকাচার, লোকবিশ্বাসগুলি সমাজ-সংস্কৃতির দিক থেকে বিচার করে দেখতে হবে। সমাজ-সংস্কৃতির ইতিহাসে এই উপাদান গুলির মূল্য অস্বীকার করা যায় না। তেমনি সপ্তদশ শতকের রাঢ়বঙ্গের সমাজ জীবনধারার নানা চিত্র রূপরামের কাব্যে উঠে এসেছে, তা থেকে রাঢ়বঙ্গীয় সমাজ সম্বন্ধে আমরা স্পষ্ট ধারনা লাভ করতে পারি। আর সমাজ ইতিহাসের নিরিখেই তা বিচার্য। রূপরাম তাঁর কাব্যে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য কথা বর্ণনা করতে গিয়ে সপ্তদশ শতকের রাঢ়বঙ্গের সমাজ-সংস্কৃতি ও জীবনচর্চার যে বিচিত্র চিত্র ধারাকে বিভিন্ন দিক থেকে তুলে ধরেছেন; সমাজ ইতিহাসের দিক থেকে তার গুরুত্ব অপরিসীম ও সবিশেষ গুরুত্বের অধিকারী।

তথ্যসূত্র :

১) কয়াল, অক্ষয়কুমার (ভূমিকা ও সম্পাদনা) : ধর্মমঙ্গল রূপরাম চক্রবর্তী বিরচিত, ভারবি,
১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা – ৭৩, ভারবি দ্বারা প্রথম প্রকাশিত : আষাঢ় ১৩৯৩, জুলাই ১৯৮৬, পুনর্মুদ্রণ : পৌষ ১৪১৭, জানুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা - ৪৮ ।
২) তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৮।
৩) তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৯।
৪) তদেব, পৃষ্ঠা - ৫০।
৫) তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৩৪।

৬) লালা, ড. আদিত্যকুমার : বাংলার ধর্মঠাকুর রূপরামের মঙ্গলগান, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০১৮, আশ্বিন ১৪২৫।
পৃষ্ঠা - ২১।

৭) সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্র ভবন, ৩৫ ফিরোজ শাহ রোড, নতুন দিল্লী ১১০০০১, প্রথম প্রকাশ : ১৯৭৫, সপ্তম মুদ্রণ : ২০১৭, পৃষ্ঠা - ৬৫।

৮) কয়াল, অক্ষয়কুমার (ভূমিকা ও সম্পাদনা) : ধর্মমঙ্গল রূপরাম চক্রবর্তী বিরচিত, ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা – ৭৩, ভারবি দ্বারা প্রথম প্রকাশিত : আষাঢ় ১৩৯৩, জুলাই ১৯৮৬, পুনর্মুদ্রণ : পৌষ ১৪১৭, জানুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা - ২২৪ ।

৯) রায়, নীহাররঞ্জন : বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব, দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : ১৩৫৬, সংযোজিত স্বাক্ষরতা সংস্করণ : ১৩৮৭, প্রথম দে'জ সংস্করণ : বৈশাখ ১৪০০, চতুর্থ সংস্করণ : অগ্রহায়ন ১৪১০, পৃষ্ঠা - ৪৭৮।

১০) কয়াল, অক্ষয়কুমার (ভূমিকা ও সম্পাদনা) : ধর্মমঙ্গল রূপরাম চক্রবর্তী বিরচিত, ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা – ৭৩, ভারবি দ্বারা প্রথম প্রকাশিত : আষাঢ় ১৩৯৩, জুলাই ১৯৮৬, পুনর্মুদ্রণ : পৌষ ১৪১৭, জানুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা - ৬৩ ।

১১) তদেব, পৃষ্ঠা - ১২১।

১২) তদেব, পৃষ্ঠা - ১২১।

১৩) তদেব, পৃষ্ঠা - ১২৩।

১৪) তদেব, পৃষ্ঠা - ১২২।

১৫) তদেব, পৃষ্ঠা - ১২৩।

১৬) তদেব, পৃষ্ঠা - ৬৩।

১৭) তদেব, পৃষ্ঠা - ৫৮।

১৮) তদেব, পৃষ্ঠা - ৫৮।

১৯) তদেব, পৃষ্ঠা - ৬৩।

২০) তদেব, পৃষ্ঠা - ৮০।

২১) তদেব, পৃষ্ঠা - ৭৫।

২২) তদেব, পৃষ্ঠা - ৭৫।

২৩) তদেব, পৃষ্ঠা - ৭৬।

২৪) তদেব, পৃষ্ঠা - ৭৬।

২৫) তদেব, পৃষ্ঠা - ৭৬।

২৬) তদেব, পৃষ্ঠা - ৭৬।

২৭) তদেব, পৃষ্ঠা - ৭৭।

২৮) তদেব, পৃষ্ঠা - ৭৭।

২৯) তদেব, পৃষ্ঠা - ৭৬।

৩০) তদেব, পৃষ্ঠা - ৭২।

৩১) তদেব, পৃষ্ঠা - ২০৬।

৩২) তদেব, পৃষ্ঠা - ৭২।

৩৩) তদেব, পৃষ্ঠা - ৫৫।

৩৪) তদেব, পৃষ্ঠা - ১০০।

৩৫) তদেব, পৃষ্ঠা - ৭৬।

৩৬) ঘোষ, বিনয় : পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি, প্রথম খণ্ড, প্রকাশ ভবন, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ, একখণ্ডে, জানুয়ারি, ১৯৫৭, অষ্টম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০১৪, পৌষ ২০২০, পৃষ্ঠা - ৬৬।

৩৭) কয়াল, অক্ষয়কুমার (ভূমিকা ও সম্পাদনা) : ধর্মমঙ্গল রূপরাম চক্রবর্তী বিরচিত, ভারবি, ১৩/১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কলকাতা – ৭৩, ভারবি দ্বারা প্রথম প্রকাশিত : আষাঢ় ১৩৯৩, জুলাই ১৯৮৬, পুনর্মুদ্রণ : পৌষ ১৪১৭, জানুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা - ০০০ ।

৩৮) তদেব, পৃষ্ঠা - ৯১।

৩৯) তদেব, পৃষ্ঠা - ১২২।

৪০) তদেব, পৃষ্ঠা - ৬৮।

৪১) তদেব, পৃষ্ঠা - ৮০।

৪২) তদেব, পৃষ্ঠা - ২০৫।

৪৩) তদেব, পৃষ্ঠা - ২৬৫।

৪৪) তদেব, পৃষ্ঠা - ১৯৭।

৪৫) তদেব, পৃষ্ঠা - ১২৮।

৪৬) তদেব, পৃষ্ঠা - ৬০।

৪৭) তদেব, পৃষ্ঠা - ৭৯।

৪৮) তদেব, পৃষ্ঠা - ৬০।

৪৯) তদেব, পৃষ্ঠা - ২২৭।

৫০) তদেব, পৃষ্ঠা - ২৯৩।

৫১) তদেব, পৃষ্ঠা - ১১৭।

৫২) তদেব, পৃষ্ঠা - ৫৬।

৫৩) তদেব, পৃষ্ঠা - ৮৯।

৫৪) তদেব, পৃষ্ঠা - ২১৫।

৫৫) তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৯।

৫৬) তদেব, পৃষ্ঠা - ১৩৭।

৫৭) তদেব, পৃষ্ঠা - ৪১৩।

৫৮) তদেব, পৃষ্ঠা - ৪৮।

৫৯) তদেব, পৃষ্ঠা - ৩২৭।

৬০) তদেব, পৃষ্ঠা - ৭৯।

৬১) তদেব, পৃষ্ঠা - ২৫৮।

৬২) তদেব, পৃষ্ঠা - ২২৭।

৬৩) তদেব, পৃষ্ঠা - ১১৫।

৬৪) তদেব, পৃষ্ঠা - ৭৯।

৬৫) তদেব, পৃষ্ঠা - ২৬৩।

৬৬) তদেব, পৃষ্ঠা - ৭২।

৬৭) তদেব, পৃষ্ঠা - ৪১৬।

৬৮) তদেব, পৃষ্ঠা - ১৬৭।

৬৯) তদেব, পৃষ্ঠা - ২৬১।